LiPi

মে লিপি

কবিতা, ছোটগল্প, অনুগল্প
এবং প্রবন্ধ সংকলন

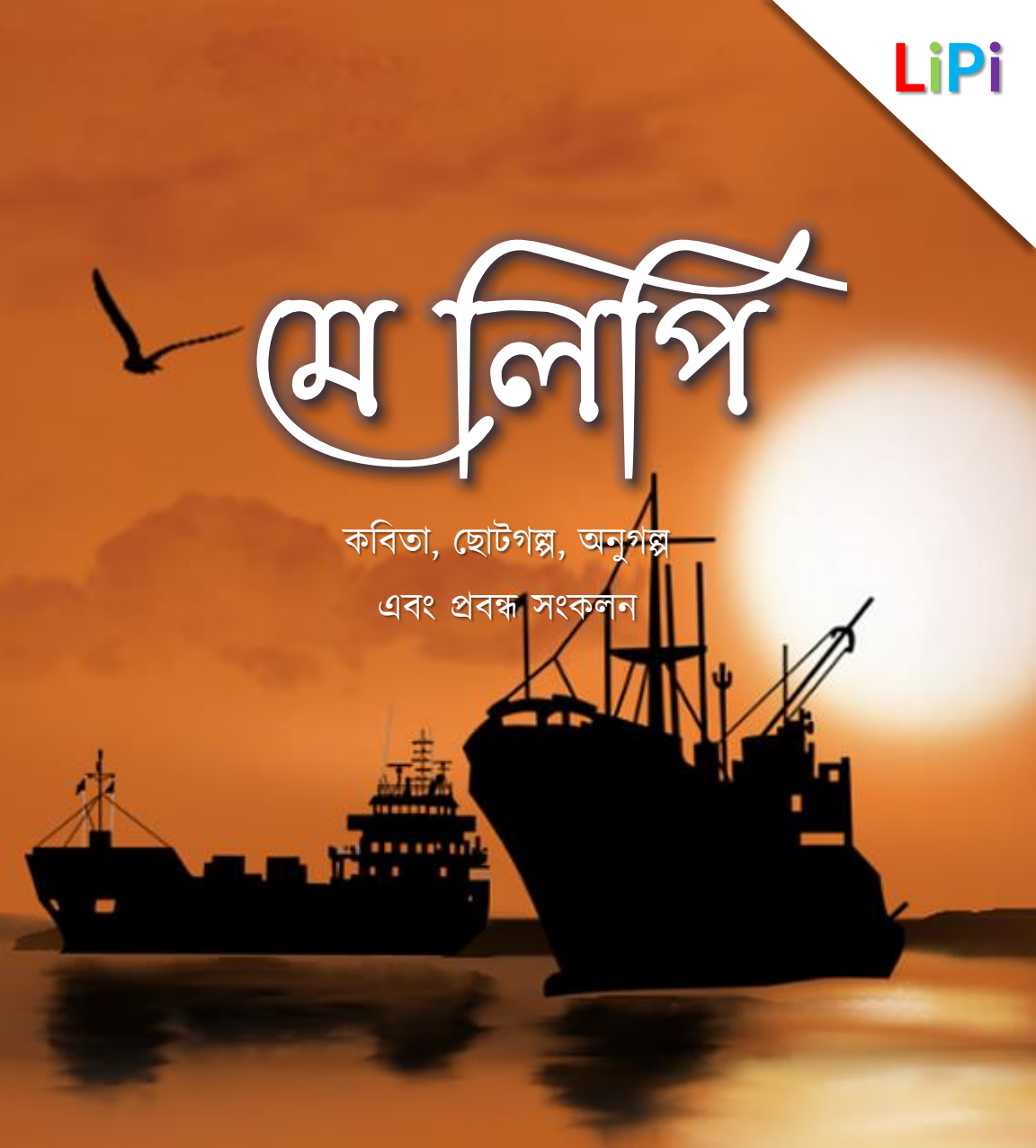

Edited by Akshay Kumar Roy
Reviewed by Gobinda Sarkar
Hosted by Lipi Magazine
Published by Lipi Publication

মে লিপি

সম্পাদক

অক্ষয় কুমার রায়

গোবিন্দ সরকার

PUBLICATION

www.lipipublication.com

মে লিপি

May Lipi

Edited by

Akshay Kumar Roy

Gobinda Sarkar

প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০২১
প্রচ্ছদ: অক্ষয় কুমার রায়
© লিপি পাবলিকেশন

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বর্ণসংস্থাপন
মালদা, পশ্চিমবঙ্গ

For Magazine – www.lipimagazine.com
For Publication – www.lipipublication.com
For Contact – contact@lipimagazine.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

লিপি ম্যাগাজিন প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমাদের ঋণের বোঝা যথেষ্টই ভারী। আমরা প্রথমেই কৃতজ্ঞ আমাদের লেখকদের কাছে। যাঁরা বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এমন চমৎকার সব লেখা পাঠিয়েছেন যা আমাদের ঋদ্ধ করেছে, আপ্লুত করেছে। বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাবনার প্রসারতা সম্ভব হতনা, যদি না লেখকেরা আমাদের পাশে থাকতেন।

একই সাথে আমরা কৃতজ্ঞ লিপি ম্যাগাজিনের সম্পাদক এবং ওয়েবসাইট টেকনিকাল টীম, যারা আমাদের নিয়মিত সাহায্য করে গেছেন এই প্রকাশনীর ক্ষেত্রে।

পরিশেষে, আমাদের কৃতজ্ঞতা বাড়ির সদস্যদের প্রতি। তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন না থাকলে এই ই-বুকটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

সূচিপত্র

- ❖ ইলিয়াস খাঁ ১০
  - ➢ ট্রাম্পেটবাদক ১০
  - ➢ যোগসূত্র ১১
- ❖ উত্তম বর্মন ১২
  - ➢ মা জননী ১২
- ❖ ক্ষিতীশ বর্মন ১৩
  - ➢ মা ১৩
- ❖ গোবিন্দ বর্মন ১৪
  - ➢ মঁচশিল্প ১৪
  - ➢ ভঙ্গুর ১৫
- ❖ চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু ১৬
  - ➢ মা বাবাকে খুঁজি ১৬
- ❖ জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ১৭
  - ➢ বিকল্প ১৭
- ❖ জয়ন্ত নাথ ১৮
  - ➢ যে গল্পের শেষ হলো না ১৮
- ❖ জয়শ্রী দাস ২১
  - ➢ কালচক্র ২১
- ❖ দেবা ২২
  - ➢ ঘৃণার আগুন ২২
  - ➢ কলরব ২৩
- ❖ নইমুদ্দিন আনসারী ২৪
  - ➢ ভোলার নয় সখি সেই দিনের কথা ২৪
  - ➢ ভুলে যাও অভিমান ২৬

- ➢ অনুভূতি ২৮
- ➢ ভালোবাসা ২৯

❖ প্রতাপ ঘোষ ৩০

- ➢ সমাপ্তি ৩০

❖ বদরুদ্দোজা শেখু ৩১

- ➢ দুই পুরুষ ৩১
- ➢ ব্যাচেলর ভাড়াটে ৩২
- ➢ তরুণ সন্ন্যাসী ৩৩

❖ বিষ্ণু পদ রায় ৩৪

- ➢ লুকোনো অশ্রু ৩৪

❖ মধুসূদন রায় ৩৫

- ➢ মায়ের স্নেহ ৩৫
- ➢ বিচিত্র ৩৬

❖ মুন্সি দরুদ ৩৭

- ➢ শিশু মন ৩৭

❖ মেরাজুল হাসান ৩৮

- ➢ অহংকারী ৩৮

❖ মোহন দাস ৩৯

- ➢ এভাবেও সব হয় ৩৯

❖ রবীন জাকারিয়া ৪০

- ➢ জয়া ৪০
- ➢ ঈবাদাহ্‌র ঈবাদাত ৪১
- ➢ করি খুশির ঈদ ৪৩

❖ রূপম শিকদার ৪৪

- ➢ মনের ডায়েরি ৪৪

- আসল বিশ্বযুদ্ধ ৪৫
- করোনা ৪৬

❖ রূপো বর্মন ৪৮
- ছেলে মানুষ ৪৮
- হায়রে গ্যাসট্রিক ৪৯
- প্রিয় আম ৫০
- ছয় পুরুষ ৫২

❖ শুভজিৎ দাস ৫৫
- সেই জানলাটা আজও বন্ধ ৫৫

❖ শ্যামাপ্রসাদ সরকার ৫৬
- যোগ-বিয়োগ ৫৬
- ইস্কুল ব্যাগ ৬০
- আনন্দস্বরূপা ৬২
- আমার সাধ না মিটিল ৬৯

❖ সঞ্জীব সেন ৭৬
- সাঁকো ৭৬
- বন্ধু ৭৭
- সহমরণ ৭৮
- যাজ্ঞসেনী আর পাঁচজন ৭৯

❖ সমাজ বসু ৮৩
- নুন ৮৩

❖ সুনীতা ৮৪
- ঠিকানা ৮৪
- ইস্তেহার ৮৫
- হরিণী সময়সূচী ৮৬

- ➢ একজোড়া ফুলকপি ও শীতকালীন বনভোজন ৮৭
- ❖ সৌমেন দেবনাথ ৮৯
  - ➢ ফাঁপা লেখক ৮৯
  - ➢ মুখশ্রুতি ৯০
  - ➢ পরচুলা ৯১
  - ➢ টুলিপের বিয়ে ৯২
  - ➢ মোহনার চরিত্র ৯৪

সম্পাদকীয়

করোনার প্রকোপে জীবন জীবিকা যখন বিধ্বস্ত সেই সময়ে লিপির জন্ম হয় ই-ম্যাগাজিন হিসেবে। শুরুটা মোটেই সুখকর হয়নি। অনেক বিধি নিষেধের মাঝেও আমরা সাপ্তাহিক ই-ম্যাগাজিন হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। জানি এ লড়াই কঠিন।

বড়ই দুঃসহ সময়ে আমাদের পথ চলা। চারিদিক মৃত্যুমিছিল আর স্বজন হারানোর আর্তনাদে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বারবার লেখার কলম থেমে যেতে চায়। কিন্তু থেমে যাওয়ার নাম জীবন নয়। তাই আমরা পণবন্দি হয়েছি কলম চালিয়েই এ লড়াই জিতবো।

লড়াইয়ে নবীন প্রবীণ অনেক পারিজাতকে আমরা সঙ্গে পেয়েছি। তাঁরা প্রতিনিয়ত লেখা পাঠিয়ে লিপিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদেরকে নিয়েই আমাদের পথ চলা। তাঁদের আরও আরও লেখায় উৎসাহী করে তোলাই লিপি ম্যাগাজিনের প্রধান উদ্দেশ্য।

সম্পাদক

অক্ষয় কুমার রায়

গোবিন্দ সরকার

ইলিয়াস খাঁ

ট্রাম্পেটবাদক

কিন্নর, এই অধরপুরী ঘোর নিরালা বাতিক। সর্বোচ্চ উচ্চতা
থেকে নিম্নগামী স্নায়বিক যাত্রাপথে বিষাদ-জানলা। ক্রমশ
বাদলাবেলায় মসীবর্ণ বোলতার চালচিত্র রতনপুরের ট্রাম্পেটবাদক।
গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে যতগুলো গন্ধর্ব লাশ। যানবাহনের বিদায় বেলায়
রক্তাক্ত অক্ষর-স্বজন সেইসব অজানা রাতপাখির আর্তি-বিহ্বল
ডানা-ভাঙা বিচ্যুতি তুলে আনো মসীবর্ণ বোলতার চালচিত্র, রতনপুরের
ট্রাম্পেটবাদক!
অধরপুরীর নিরালা বাতিক, কিন্নর, আশঙ্কায় ছয়লাপ ভ্যাকসিন
প্রক্রিয়াকরণ।
গাও, কিন্নর, অধরপুরীর মৃত্যু-সমাপতন।

যোগসূত্র

অনাবশ্যক যোগসূত্র মাঝে মাঝে বিরুদ্ধ
পথে ছিন্ন হয়ে যায়।
অন্তত কুড়ি হাজার জাদুবলয় ঘিরে রাখে
ভুবনডাঙা মাঠ।
ধানজমি শস্যশূন্য
বিগত রাশি রাশি বীজানুকীট আমারই
অস্বচ্ছ প্রহেলিকায় ধারণ করে সমাহিত পুকুর।
সত্তার মতো বিকল অথচ ট্রেনগামী ল্যাম্প পোস্ট
বিদায়-সমাবেশ।
সমাহিত পুকুর ধারণ করে কুড়ি হাজার জাদুবলয়
ভুবনডাঙার মাঠ।

উত্তম বর্মন

মা জননী

পরের দুয়ারে দাসী বটে আজি, তবু সে মোদেরই মা,
ভুলিবারে চাই সতত সে কথা, ভুলিবারে পারি না।
কাঙ্গালের ঘরে যাহা কিছু জোটে, সে যে ধুলিমাখা খুদ,
উপবাস ক্ষীণ শীর্ণ বক্ষে, শুকায়ে গিয়াছে মুখ।
তবু তাই খেয়ে বাচেঁ এই প্রাণ, তাই দিয়ে এই দেহ,
ধুলামাটি মাখা তাহারই বক্ষে, বাধি দুদিনের গৃহ।
হার্টিতে শিখেছি যার হাঁটু ধরে, যে বুকে মেলিয়া পা,
হোক ভিখারিনী তবু সে জননী, কেমনে ভুলিব তা।
এস তপস্বী, উগ্রশক্তি, এস হে কর্মবীর,
কর দৃঢ় পণ মায়ের চক্ষে মুছাতে অশ্রুনীর।
পায়ে পায়ে যত বিভেদের বাধা, ভুলায়ে পরস্পরে,
ভায়ে ভায়ে আজি মিলাইতে হবে,জননীর ভাঙ্গা ঘরে।
এস হে হিন্দু, এস খ্রিষ্টীয়, পারসী,মুসলমান,
যে মায়ের জঠরে জন্ম তোমার, রাখো আজি তার মান।

ক্ষিতীশ বর্মন

মা

তুমি আমায় জন্ম দিলে তুমি করলে বড়ো,
তুমি আমার প্রথম শিক্ষা তুমি আমার আলো।
তোমার যত ভালোবাসা দিয়েছো আমার কোলে,
আজ পর্যন্ত বুঝতে দিলে না দুঃখ কাকে বলে।
আমার যত কামনা বাসনা পূর্ণ করেছো তুমি,
তোমার জন্য আজও আমি অভাব বুঝিনি।
আমার যদি কিছু হতো তুমি বুঝতে আগে,
তখন তুমি ছাড়া কেউ ছিল নাকো পাশে।
তোমার মত ভগবান হয়তো পাবো না এই জীবনে,
তাই তো 'মা' গো তোমায় পেতে চাই পরবর্তী জীবনে ।

গোবিন্দ বর্মন

মঁচশিল্প

চারিদিকে শুধু অঘোষিত মঁচশিল্পের রমরমা!
কিন্তু শিল্পের দেশে বিরোধিতা বারণ।
শুল্ক বিহীন এই শিল্পে, ফলিতার্থ ঢের।
রাজার দোষে প্রজা 'দামাল' লজ্জা কিসের?

ব্যক্তিচতুষ্টয়ে বিশ্ব জয়, বিলাসিতা জীবন।
পায়ের মাটি মন্থর হলে অন্যত্র পদার্পন।
সাদাজামা রক্তে মাখা, যেন জাদুর কারবার।
সমাবেশে রক্তের গন্ধ, যেন যুদ্ধের সংকেত।

তবুও শিল্প চলবে, আপত্তি যে বারণ।
অন্ধকারে কৃত্রিম তারা, যেন প্রভাতী সংকেত।

রাজার আবার ইন্দ্রসভা নর্তকীর সমাবেশ।
দানবীরের দিকে সুদৃষ্টি যেন মঁচশিল্পের লেশ!

ভঙ্গুর

সীমাহীন দিগন্তে একচিলতে সূর্য।
ভাসমান স্বপ্ন আজ বিদ্ধ, যেন অপুস্পক বৃক্ষ।
কালিমালিপ্ত দৃষ্টি ধৃতরাষ্ট্রের প্রাদুর্ভাব,
মাংসবিহীন কঙ্কাল অ্যাসিডের কারবার।

রাজার রাজ্যে নারী-তন্ত্র সীমাহীন উল্লাস!
রক্তচোষক মাকড়সা যেন স্বাস্থবান হাতি।
'বিনায়ক' আজ অকর্মক মনসার ছলনায়।
সৃষ্টিকর্তার ধ্বংস রূপ মহাদেবের বিকার!
বুদ্ধিজীবী আজ শান্ত যেন স্বভাবের দোষ।
আহা! রাবনের কারাবাস, এ যেন লংকার সর্বনাশ!

চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু

মা বাবাকে খুঁজি

মা গেল বাবার পরে
বাবা গেল আগে,
বড্ড কষ্ট লাগে।

সবার কাঁধে চড়ে চড়ে
সেই যে গেল চলে,
কাঁদি চোখের জলে।

বল বাবা বল মাগো
আসবে কবে ফিরে,
স্মৃতি আছে ঘিরে।

ঘরটি আজও ফাঁকা ফাঁকা
কেমন করে থাকি,
তোমরা দিলে ফাঁকি।

এ ঘরতে ও ঘরেতে
সকল সময় খুঁজি,
কষ্ট এখন বুঝি।

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

বিকল্প

পারি না এমন নয় ভেঙে দিতে সব ব্যবধান
তুমি যে উত্তরহীন এটুকু দূরত্ব প্রায় উড়ে যায়
জেলখানা গান।
প্রথমে আগুনই ছিল সকাল পরিবর্ত বিকেলে
তুমি আসবে ভাবনার আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়
কাকের ডানায় ঠিক উড়ে যেত।
এখন মুহূর্তগুলো খুব ভারি বিমল অভ্যন্তর
বহিরঙ্গ উপচানো নর্দমায় গেছে।
তুমিও আসো না বলতে দ্বিধা নেই যদি আসো তবু
নিশ্চিত জানি এই গ্র্যানাইট দৃঢ় অন্ধকার অভঙ্গুর।
এত চেনা মুখ শব্দ পরম্পরা কীভাবে রাখার?
তার চেয়ে কংক্রিট পথ ফেলে নেমে যাই ভূমিজ পাড়ায়
নগণ্য চাওয়ার পাশে হাঁস-মুরগি সংসার কোলাহল গান
ওখানে অন্ধকার মাঠে জোনাকির ফুল.... আলো আর আলো।

জয়ন্ত নাথ

যে গল্পের শেষ হলো না

এক অফিসের বস ওনার লেডি সেক্রেটারিকে বললেন –"কাল আমরা অফিসের সবাই পাঁচ দিনের ফ্রান্স ট্যুরে যাবো। তোমরা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করো।"

তাই শুনে লেডি সেক্রেটারী ওনার স্বামীকে ফোন করে বললেন – "এই শোনো। আমরা অফিস স্টাফ পাঁচ দিনের জন্য ট্যুরে যাবো। আমি ঘরে থাকবো না তাই তুমি কিছু দিনের জন্য যেভাবে পারো ম্যানেজ করে নিও।" এই কথা শুনার পর সেক্রেটারীর স্বামী তড়িঘড়ি করে উনার এক বন্ধু রতনকে ফোন করলেন। রতন ফোন তুলেই বললো – "কি রে? কি খবর অনেক দিন পর ফোন করলি। কেমন আছিস?" এপার থেকে বন্ধু উত্তর দিল : "কেমন আছি, কোথায় আছি ওসব পরে কথা হবে। এবার শোন। আমার বউ কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে। তুই চলে আয় আমরা বন্ধুরা মিলে পার্টি করবো।" সেই কথা শোনা মাত্র রতনও ভাবলো সত্যিই তো অনেক দিন হলো বন্ধুদের সাথে আগের সেই আড্ডা দেওয়া হয় না। রতন বলে উঠলো -"আচ্ছা আচ্ছা বেশ। তাহলে আমি কালই আসছি।" রতন ঠিক করে ফেলল যে সে বন্ধুর বাড়ি যাবেই। রতন তখন তার স্ত্রী লিলিকে ফোন করে বললো – "লিলি, আমি কিছুদিনের জন্য বন্ধুর বাড়ি ঘুরতে যাচ্ছি। বাড়িতে কদিন পর ফিরবো।"

এবার বরের ফোন রাখা মাত্রই লিলি ওর এক বান্ধবী মায়াকে ফোন করে বললো – "মায়া শোন, আমার বর কদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে

তুই তাড়াতাড়ি চলে আয়। দুজন মিলে ঘুরবো আর সিনেমা দেখতে যাবো।" এই বলে ওর মন বেজায় খুশি।

এবার লিলির বান্ধবী মায়া এই ফোন পেয়ে তার কাছে টিউশন পড়তে আসা এক ছাত্র পাপ্পুকে ফোন করে বললো – "কাল আমি একটু ঘুরতে যাচ্ছি। তুমি কদিন পরে পড়তে এসো।" এই কথা শুনে পাপ্পু খুব খুশি হলো যে তাকে কদিন আর বইটই এর কাছে আসতে হবে না। পাপ্পু এবার তার মামাকে ফোন করলো এবং বললো -"মামা আমার মিস কদিন পড়াতে আসবে না। তাই আমি তোমাদের বাড়ি ঘুরতে যাবো।"

এবার ব্যাপারটা এসে দাঁড়ায় এইরকম ।প্রিয় ভাগ্নে পাপ্পু মামার বাড়ি আসতে চাইছে শুনে মামা ওনার অফিসের লেডি সেক্রেটারীকে বলেন – "আমার ভাগ্নে অনেকদিন পরে আমার বাড়িতে আসছে সেই জন্য ট্যুর আপাততো ক্যান্সেল।" লেডি সেক্রেকারী আবার ওনার স্বামীকে ফোন করে বললেন -"এই শোনো। আমাদের ট্যুর ক্যান্সেল হয়ে গেছে।" এবার সেক্রেটারীর স্বামী ওর বন্ধু রতনকেও ফোন করে বলে -"রতন তুই এসেও এখন আর লাভ হবে না । আমার বউ এর ট্যুর ক্যান্সেল।"

একইভাবে বন্ধু রতনও ওর স্ত্রী লিলিকে ফোনে একই কথা বললো। এবং তা শুনে লিলিও মায়াকে পুনরায় ফোনে বললো – "মায়া শোন । আমার বরের যাওয়া এখন ক্যান্সেল। উনি যদি আবার কোথাও যাওয়ার প্ল্যান করেন তবে আমি তোকে ফোন করবো।" মায়া তখন তার টিউশন পড়তে আসা পাপ্পুকে ফোনে এই একই কথা জানায় যে ওর যাওয়ার ছুটি ক্যান্সেল এবং কাল থেকে ওর টিউশন অব্যাহত থাকবে । একইরকম পাপ্পু ওর অফিসের মামাকে ফের ফোনে যখন বললো যে

মামা আমি আর তোমাদের বাড়ি আসছি না । মিস বলেছে যে ওনার ছুটি ক্যান্সেল। ওই সময় মামা ওনার লেডি সেক্রেটারীকে ফের কি বলবেন আপনারা তা বুঝতেই পারছেন।

এবার আপনারাই বলুন – এরা কি কোনো দিন ট্যুরে যেতে পারবে?

জয়শ্রী দাস

কালচক্র

সময়কে সময় দিতে জানতে হয়।
সময়ের দাবী সেই মেটাতেই হয়;
কয়েকটা সময় আরো একটু সময় পেলে বাকি সময়টা এত দীর্ঘ হয়ে যেতো না বোধহয়;
কিছু বয়ঃপ্রাপ্ত সম্পর্ক কম ঝুলতো ওড়না জড়িয়ে সিলিং ফ্যানে।
তিনটে ইঁট, তিনটে বাহু, আমি তুমি আর সময়
ত্রিভুজ উনুনে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ত্রিসংসার
নি:শ্বাস এখানে প্রহরী,
শাকান্ন দিয়ে তাকে তুষ্ট রাখতে হয়
এই শাকান্ন তোমার আমার জীবনের ভাগশেষ,
আর সময়, ভাগফল।।

দেবা

ঘৃণার আগুন

আমি এক জলন্ত অগ্নিপিন্ড,
সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো,
অনেক কিছুই গাঁথা আছে মনে।।

অগ্নুৎপাত ঘটেনি এখনও,
লাভা, ম্যাগমা বেরোয়নি,
যার সবটাই চাপা গোপনে।।

মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে বুক,
চিন্তায় করে ধুক-পুক,
ভবিতব্য এমন হবে, ভাবিনি স্বপনে।।

নীলকণ্ঠ হব, বিষ কুড়োব,
বিষ্ণুর মতো, অমৃত বিলাবো,
সুখী থাকবে সব আপনে।।

কিসের লালসা, কিসের অহংকার,
স্বপ্ননগরী শুধুই ছারখার,
আপনদেরই বিষ রোপনে।।

বাঁচার আর ইচ্ছা করে না,
কর্তব্য তবু পিছু ছাড়ে না,
দগ্ধ এ বুক, ঘৃণার আগুনে।।

কলরব

বেদুইনের মতো ঘুরেছি কত, দেখেছি কত ছল,
বিনাপানিতেই নত মস্তকে, ফুটেছিল শতদল।
তারই আশিস মাথায় নিয়ে, ঢুকেছি শিক্ষা শিবিরে,
হাসবো, খেলবো, শিখব, হবো সাধারণের সম্বল।।

চিন্তাধারা ধূলিসাৎ, ঘিরেছে অবসাদ, হয়েছি নীরব,
রাজনীতিরই পদকমলে, সঞ্চিত যত ক্ষমতা সব।
বিদ্যে-বুদ্ধি মাথায় নিয়ে, বসে আছি খিদে নিয়ে,
ভাতা নয় চাকরি চাই, হচ্ছে তারই কলরব ।।

নইমুদ্দিন আনসারী

ভোলার নয় সখি সেই দিনের কথা

ওগো সখি জীবনের তরী বেয়ে আজ এসেছি অনেকদূরে,
হাজারো স্মৃতি পতিত হয়েছে অতীতের অতল সমুদ্রে,
মরুভূমির ছোট্ট জলাশয়ের ন্যায় বিলীন হয়ে যায় তাদের অনেকেই,
তবে বারবার ফিরে আসে মনে সেই দিনের কথা ক্ষণেকই।
সেই হেমন্তের হিমেল হাওয়ায় ভেসে আসা তোমার,
কোকিলা সুর ভোলার নয় প্রিয়তমা।
ভোলার নয় সখি সেই দিনের কথা...
তপ্ত তপনে দাঁড়িয়ে থাকা আমি ক্ষনিকের জন্য,
সেই সুরে ভেসে গেছিলাম আবেগ প্লাবনে।
ফিরে তাকাতেই তোমার সেই মায়াবী চোখের মায়ায়,
কখন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম জানতেই পারিনি।
ভোলার নয় সখি সেই দিনের কথা...
তারপর সেই দুরুদুরু বুকে শুরু হলো আমাদের পথ চলা,
সেই গ্রাউন্ড হতে তিনতলা বিল্ডিঙের দিকে।
কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই তুমি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে,
তা তোমার মায়াভরা মৃদু চোখদুটির চাহনিয়েই বলে দিয়েছিল আমাকে।
ভোলার নয় সখি সেই দিনের কথা...
তোমার সেই ক্লান্তির কারণ সেই পিঠে ঝোলানো বই ভর্তি ব্যাগটা।
কারণ তুমি তো আবার সেই আলেকজান্ডার পোপের "বেলিন্ডা"র ন্যায়।

তাই সেই তোমার ব্যাগটা কাঁধে থাকা আমার ব্যাগের সাথে,
উপরে নিয়ে পা রাখলাম পরবর্তী সিঁড়িতে।
তিনতলায় পৌঁছাতেই ফ্লোরে বসে পড়লাম,
আমরা দুজনেই ক্লান্ত পথিকের ন্যায়।
বসতেই তুমি বার করলে ব্যাগ হতে ঠান্ডা জলের,
বোতল টা আর তুলে দিলে আমার হাতে।
ঠান্ডা বোতল টা হাতে নিতেই হৃদয় টা শীতল হয়ে ওঠে ছিল।
তার পর পান করলাম দুজনে সেই বোতলের ঠান্ডা জল,
যা কল্পনা করলে আজও তপ্ত হৃদয়টা কে মুহূর্তে শীতল করে দেয়।

ভোলার নয় সখি সেই দিনের কথা....
তারপর সেই এক ডেস্ক এ বসে শুরু হলো,
পৃথিবীর হাজারো গল্প, হাজারো প্রশ্ন-উত্তর।
আমার মনের হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিলে তুমি,
দিলাম উত্তর আমিও তোমার শত শত প্রশ্নের।
কিন্তু.....
ভোলার নয় সখি সেই দিনের কথা....

ভুলে যাও অভিমান

ভালো ছিলাম আমি, তুমিও ভালো ছিলে,
একসঙ্গে কেটেছি হাজারো প্রহর দুজনেই।
হাজারো ব্যস্ততার মাঝে রেখেছিলাম পা তোমার শহরে,
তুমিও আনন্দের সঙ্গে আলিঙ্গন করেছিলে প্রত্যেহ প্রহরে।
মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়েছি তোমার নীল আকাশে,
তুমিও দাওনি বাধা কোনোদিন বেড়াতে তোমার বাতাসে।
ধীরে ধীরে অনেক ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমি,
কখনো বা বন্ধুদের আড্ডায়, কখনো বা নিজের কাজের ব্যস্ততায়।
ক্লান্ত হতে হতে তোমার কথা মনেই আসতো না আমার।
আমি ভুলে যেতে থাকলাম তোমার সেই অপূর্ব সোন্দর্য।
দিনের পর দিন তুমি সহ্য করেছো আমার অবহেলা,
তুমি রয়েছো বসে আমারই অপেক্ষাই তিন বেলা।
বিকেলের ডুবন্ত সোনালী সূর্যের সোন্দর্যতায়
একলা কেটেছে তোমার হাজারো দিন বিষন্নতায়।
বাগানের বিহঙ্গের মধুর সঙ্গীতের সাক্ষী হয়েছো তুমি একাকী,
আনন্দিত হয়েছো তুমি নিজেই চাক্ষুষ করে রজনীর জোনাকি।
ওই নীল আকাশ ঝকঝকে ধ্রুব তারা আর চাঁদে,
তাকিয়ে ছিলে তুমি হাতটা রেখে তোমারই ওই কাঁধে।
অবশেষে তুমি আজ হলে অভিমানী দেবী,
আর আমি হলাম তুচ্ছ এক বিরহের কবি।
ভুলে যাও, পৃথিবী, তুমি তোমার সব অভিমান,

আজ একলা ঘরে থেকে বুঝেছি তোমার মান।

তুমি শান্ত, স্নিগ্ধ এবং শীতল তোমার শহরে আজও,

আমিই শুধু পারিনি তোমার যত্ন নিতে কখনও,

আজ অঙ্গীকার করি তোমার যত্ন নেওয়ার হাজারো ব্যস্ততার পরেও।

অনুভূতি

সেই দিনটা আজও হৃদয়ের ক্যানভাসের,
কোনো এক ঠিকানায় ঠিক বিরাজ করে।
হাজারো প্রাণপণ প্রয়াস বারে বারে ব্যর্থ,
পরাজিত করতে সেই দিনের স্মৃতি নিবারণে।
মুহূর্তে হাজারো হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নগুলো,
এসে ভিড় করে মনের অজান্তেই।
সঙ্গে নিয়ে আসে কিছু আনন্দের অবকাশ,
আর কিছু বিসন্ন, ব্যাকুল হৃদয়ের হাহুতাশ।
কেমনে ভুলে যায় বলো সেই সব স্মৃতি,
যা আজও মনের অতল গভীরে করে আবৃত্তি।
হেমন্তের হিমেল হাওয়া,সামনে কাশফুল,
নীলাকাশে বাধামুক্ত সূর্যের রশ্মির নিচেই,
ছিলাম দাঁড়িয়ে আমরা বন্ধুগণেরা।
হঠাৎ একটা মধুর কোকিলা সুর কহিল ,
“রৌদ্র কি তোর লাগছে না? ছায়াতে আয়,
চল আমরা গল্প করি বসে হলঘর টায়।”
রৌদ্র লাগেনি সেদিন কিন্তু মনে কিছু ছোঁয়া লেগেছিল,
কারণ তাঁর সামনে বন্ধুরা মোর বেশ তামাশা করেছিল।
বেরিয়ে গেলাম দল ছেড়ে, রং লেগেছিল মনে,
ব্যাগ নিয়ে হেঁটেছিলাম দুজনে রঙিন পৃথিবীর কোণে।.....

ভালোবাসা

দুটি মন দুটি জায়গায়
ঘুরে বেড়ায় একা একায়।
একটি আমার গ্রামে,
আর একটি তোমার শহরে।
অভিমান আর রাগ করে আদরে,
ভালোবাসে, স্নেহ করে আর কান্নাও করে,
তবে তা সবটায় দুজনের মনের অন্তরে।
তোমাকে নিয়ে আমার মন কবিতা লিখে,
হয়তো তোমার মন টাও সান্ত্বনা দিতে শিখে।
দুজন আজ দুজনের কাছে হয়েছি অপরিচিত,
যদিও কিছুদিন আগে দুজনে ছিলাম পরিচিত।
আমি নিশ্চিত তুমি হাজারো ব্যস্ততায় ভুলোনি,
সেইসব পুরনো দিনের হাজারো স্মৃতির তরণী।
বেঁচে থাক ভালোবাসাটা না হয় মনের অন্তরে,
আমাদের এই অবাক সমাজের বিচিত্র বিচারে।

প্রতাপ ঘোষ

সমাপ্তি

অকারণ মনের ব্যার্থতা, নিরাশা, নিরালা ব্যস্ততায় দাপাদাপি অগভীর যন্ত্রণার ক্লান্ততার অবসান।

চারিদিকে চোরাবালির ওই অগভীর ডাক ধু ধু করে চলছে।
বিশ্ববরেণ্য! মানসিকতা বুক ছার-খার, দিনে দিনে।
অবলা জীবেরা সুর তুলেছে প্রাগৈতিহাসিক এর কাছে!
ওই দূরে শোনা যায় শান্ততার অগভীর কোলাহল।
দূরে থাক সব
উঠেছে ওই শবের ডাক।
আমি তো এই শব এর দে-শ এর পাহারায়!

বদরুদ্দোজা শেখু

দুই পুরুষ

এতো রাতে কে বাজায় মরমীয়া ভাটিয়ালি সুর
বাঁশের বাঁশিতে? কিহে, ক'টা বছরেই সব ভুলে
গেছো বেমালুম? মনে নেই—কত নিঝুম দুপুর
রাতে অন্ধকার নিঃসঙ্গতার নৌকায় দুলে দুলে
কারুময় মীড় তুলে তুলে ভাঁজতো সে ভাটিয়ালি—
গাঙের গফুর মাঝি, সেই তোমার নাবিক চাচা,
আজ মরহুম? মোহন মায়ার উন্মন খেয়ালী
সুর চরের ওপার হ'তে এসে বুকে দিতো ঢেউ,
ভ'রে যেতো তখন তোমার বাচ্চা বয়সের কাঁচা
মন কী-এক গৌরবে; মায়াময় হতো রাত, হতো
চাঁদ তারা ছায়াপথ মোহনায় মৌন সমাগত।
—তার ছেলে আজো সেই ডিঙা বায়, ব'লে উঠে কেউ।

অন্তঃপুর বিস্মৃতির ঝোপঝাড়ে চালাই বুরুশ,
নান্দনিক চেতনার চর রূপ-নারা'ণের কূলে
ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ স্মৃতির সপ্তডিঙা উঠে আসে
সুরের মোহিনী পালে অলৌকিক আবিষ্ট বাতাসে,
আজীবন দড়ি-ছেঁড়া আকাঙ্ক্ষার মোহের মাস্তুলে
দেখি, তন্ময় শিল্পের সেতুবন্ধ দুইটি পুরুষ।।

ব্যাচেলর ভাড়াটে

ভাড়াটে বাড়িতে আমি চুপচাপ থাকি, ভয়ে ভয়ে
সঙ্কুচিত চোখ-কানে চলাফেরা করি, পাছে কেউ
কোনো অপবাদ দ্যায়, একে ব্যাচেলর, ব'লে ক'য়ে
বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনোক্রমে পেয়েছি সামান্য ঠাঁই
হা-ঘরে শহরে, তাই নালিশের সংশয়ের ফেউ
পিছু ঘুরে, ভরসা নতুন-জোটা বন্ধু যে-ক'টাই।
নেপথ্যে কটাক্ষ ঘুরে, ঘুরে মৃদু মন্তব্যের ঝাঁজ
আড্ডাবাজ মেয়েদের, বড়ো হয় ভয়ের জড়ুল,
ভয় আরো অধিক বাড়িঅলীর তিরিক্ষি মেজাজ–
চড়কগাছ চোখ কখন্ যে সাজাবে চক্ষুশূল
অসাবধানের ভুলচুকে, তাই আমার যা কাজ
নীরবে করাই ভালো, ভালো থাকা আত্ম-মশগুল।

চোখ কান মগজে দেয়াল তুলে' আধুনিক সভ্য
সমাজের ভদ্রতা ধাতস্থ করি পৌর কায়দায়
সুখে সুখতলি ঠুকে, লক্ষ্যহারা জীবনের নব্য
নাট্যে আমি এক অধম নায়ক; আরক্ত দ্বিধায়
এড়াই ফ্যামিলি-প্রশ্ন মুরুব্বিজনের; নিরাপদ
দেয়ালে নৈঃসঙ্গ্য মাথা কুটে, চোখে বিনিদ্র বিভ্রম,
ডাইনীর উপদ্রবে একা একা থাকার বিপদ
বাড়ায় ভূতুড়ে রাত,ভরসা দ্যায় আঁতুড় কলম।।

তরুণ সন্ন্যাসী

একটা সন্ন্যাসী যায় রাস্তা ধ'রে আনমনে হেঁটে,
মুখ তুলে আশপাশে চায় না সে, চুলদাড়ি ছেঁটে
ফেলেনি সে বহুদিন, কাঁধে ঝোলানো থলি, পরনে
পুরাতন পরিচ্ছদ, পট্টি দেওয়া চপ্পল চরণে;
কেউ কেউ ব'লে উঠে- 'একেবারে বয়সে তরুণ',
কেউ বলে 'বাউন্ডুলে'; ঘুণ-ধরা আত্মার উকুন
বাছার বিশ্বাস কিছু হেঁটে যায় পদক্ষেপে, বুক
অনিশ্চয়তা-স্পন্দিত, চোখ প্রত্যাশার স্বপ্নভুক।

কোথায় গন্তব্য তার বোঝাই যায়না, হয়তো সে
নিজেও জানে না, কোনো তীব্রতর তাড়নার বশে
বেরিয়ে পড়েছে পথে অকস্মাৎ তারুণ্যের তোড়ে,
খুঁজবে সে নির্বাণের পথ জীর্ণ জীবনের মোড়ে
মোড়ে একনিষ্ঠ তপে, তাই গৃহত্যাগী হয়তো-বা
বেকার বুদ্ধের কপি হেঁটে যায় হতাশায় বোবা।।

বিষ্ণু পদ রায়

লুকোনো অশ্রু

মাঝ রাতে হঠাৎ শব্দ পেলাম শুনতে
কে যেন ডুকরে কাঁদছে, তার গোঙানিতে
সমস্ত ঝিঝি পোকার গান স্তব্ধ, মেহগুনীর অন্ধকার
এই মহলটাকে জাঁকিয়ে তুলেছে, জোনাকিরা
সূক্ষ্ম আলোয় খুঁজতে বেরিয়েছে, অজানা উদ্দেশ্যে
পাবে বলে, হারিয়ে যাওয়া সম্পদ এই দেশে।।

শিকারের দল এই বুঝি আসছে ধেয়ে গন্ধ পেয়ে
কিছু শীর্ণ দেহধারী প্রাণী রক্ত শুষে নিচ্ছে, ইচ্ছেমতো
এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে আবার নিংড়ে নিচ্ছে
খুঁজে পেয়েছে জোনাকিরা একটি দেহ, ছেড়া-ফাটা
কাপড় ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার মতো
শুষে নিয়েছে সব, প্রাণটুকুও ছাড়েনি সবকিছু পেয়ে।।

জোনাকিরা কি পেরেছে ফেরাতে তাদের
বহুকাল আগে যেভাবে ফিরিয়েছিল বাবুই পাখিদের?

মধুসূদন রায়

মায়ের স্নেহ

মা যে আমায় পাগল বলে!
মায়ের পাগল হই আমি।
সাধ করে মা নাম রেখেছে,
নামেই হব ধন্য আমি।।
বুঝবে সেদিন ফিরবো না যেদিন,
তোমার ছোট্ট কুঁড়েঘরে।
বলবে আমায় বুঝেছি খোকা-
কেন করিস এমন রে?
জড়িয়ে ধরে বলবে তুমি,
আয় খোকা আয়-
আমার কোলে।

বিচিত্র

কতই যে ঘটনা, ঘটিছে হেথায়!
চিত্রগুপ্ত বসিয়া লিখিছে তথায়।।
কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়া মাঝারে।
কে চায় কী? পায় কী তাহারে?
সত্য যেটি ভাবা যায়, সেতো সত্য নয়।
নীলকান্ত মণী যাহা, সেতো নীল নয়।।
রূপ, গুণ নাই থাক, থাক যদি মনে।
ফিরাবে কেমনে সে রোদনের ক্ষণে।।
যাহা বলেনি, করেনি প্রকাশ,
অপ্রকাশ কারো কাছে কী যে সর্বনাশ।।
মায়াময় জগৎ যে মায়ারই আকর।
যমরাজ ভেবে তাহা হইলেন পাথর।।

মুন্সি দরুদ

শিশু মন

শিশুটি কখনো আর স্কুলে যায় না,
সে স্কুলে যাবার আগে ধরে বায়না।
গ্রামের লাল রাস্তায় টায়ার চালায়,
তাকে ধরতে গেলেই ছুটে পালায়।

গাছের ডালে সবুজ রঙ পাতা নড়ে,
শিশুরা বাড়িতে অ আ ক খ পড়ে।
যে শিশুরা পড়াশোনায় ফাঁকি দেয়,
সে খেলার জন্য টায়ার সাথে নেয়।

আবার ছোট বেলার কথা মনে পড়ে,
ইচ্ছে হয় টায়ার চালাতে শিশুমন গড়ে।

মেরাজুল হাসান

অহংকারী

জমি নেই,
আছে জমিদারী।
টাকা নেই,
বোঝায় পকেট ভারী।
ডিগ্রী নেই,
দেখায় ডিগ্রিধারী।
বড়ো নয়,
ছোটো করে সবই।
সন্মান নেই,
বোঝায় সম্মানধারী।
দেনা আছে,
বলে পাওনাদারি।
আয় নেই,
দেখায় ব্যবসাদারি।
বাড়ি আছে,
ঋণে ভরা সবই।
গাড়ি আছে,
আয়ের নয় চাবি।
জ্ঞান নেই,
বোঝায় অধিক জ্ঞানী।
অহং নেই,
শুধুই অহংকারী।।

মোহন দাস

এভাবেও সব হয়

এভাবেও ভালবাসা যায়
হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙলে তোমার এলো চুলের ছোঁয়ায়
এভাবেও হয় গায়ে মাখামাখি প্রেম
এক আকাশ প্রতীক্ষা ও দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায়।
এভাবেও তোমাকে প্রতিদিন বলা যায়
নির্ঘুমে ঘন গহীনে, একটি পূর্ণ মানবীর রূপ নাও
এভাবেও মান অভিমান লুকিয়ে বলতেই পারি প্রত্যহ
আজ যন্ত্রনা হীন ভালবাসা দাও।
এভাবেও জীবন কুড়ানো যায়
ভাসানো যায় গোলাপ ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে
এভাবেও তোমায় ভালবাসা যায়
অদৃশ্য সংসার ও ঘর বাঁধা যায় নদী তীরে।

রবীন জাকারিয়া

জয়া

আমায় যখন বললে ডেকে
আর এসো না তুমি
পা দু'টো মোর গেল বেঁকে
দুললো নীচের ভূমি।

তোমায় পাওয়ার আশাচ্ছলে
কাটতো নিঝুম রাত
সবাই এখন কথাচ্ছলে
করছে কুপোকাত।

এই তুমি কি সেই তুমি
নেইকো কোন দয়া
ভালবেসে দিয়ে চুমি
নাম দিয়েছি জয়া।

ঈবাদাহ্‌'র ঈবাদাত

আমাদের একমাত্র কন্যা। বাইয়াতুন ঈবাদাহ্। সকলে ঈবাদাহ্ নামেই ডাকে। ছোট্ট মেয়ে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বলে। মিষ্টি লাগে। তাই সকলে ওকে খুব ভালবাসে। এমনকি ওর স্কুলের শিক্ষকরাও। ও শহরের একটি মান সম্মত স্কুলের নার্সারিতে পড়ে। স্কুলটির নাম নর্থ ব্রিজ স্কুল। ওর ক্লাশে ও সবচেয়ে ছোট। কিন্ত পড়াশুনায় খুব ভাল। মেধাবী। সকল Exam-এই সে সেরা তিনে থাকে। ওর স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের প্রায় সকলেই সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে জড়িত থাকার কারণেই বোধ হয় স্কুল ছুটির পর বিকেলে সহপাঠক্রমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে চিত্রাঙ্কন, গান ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। আমার মেয়েটিও আনন্দের সাথে নিয়মিত উপস্থিত থাকে। কোন ক্লাস মিসড করে না। অবশ্য করলে জরিমানা দিতে হয়।

প্রতিদিনের ধর্মীয় ক্লাস করার পর ওর মনে প্রশ্ন জাগে "ঈবাদাত কী?" বাসায় এসে একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "বাবা ঈবাদাত কী?" ও ছোট মানুষ তাই এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় বলা কঠিন। আমি তাই সহজ করে বললাম, ঈবাদাত মানে হচ্ছে এই ধরো নামাজ, রোজা, সত্য কথা বলা, অন্যের ক্ষতি না করা এইসব। আচ্ছা! আমিতো তোমার সাথে নামাজ পড়ি (মাঝে মাঝে ও আমার সাথে নামাজ পড়ে। কখনো পিঠে উঠে। কখনো কোলে বসে থাকে। কিন্ত রাগ করিনা কখনো)। তাহলে আমাকে রোজা থাকতে হবে তাই না বাবা? ক'দিন পর পবিত্র রমজান শুরু হবে। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম এখন তোমাকে রোজা থাকতে হবে না। একটু বড় হও মা। তখন রোজা রেখো। কিন্ত সে রোজা থাকবেই জেদ ধরলো। চিন্তা করলাম রোজা আসতেতো আরো কিছুদিন বাকি আছে। এর মধ্যে ও ভুলে যাবে ভেবে বললাম ঠিক আছে। রোজা থেকো।

ক'দিন পর রমজান শুরু হলো। প্রথম রমজান। সবাই সেহরি-ইফতারের ব্যবস্থা নিচ্ছি। রাতে সে হুট করে বললো রোজা সে থাকবেই। কী আর করা সেহেরির সময় ডেকে তুললাম। সেহেরি করলো। তখনো আমরা জানি এটা শুধু ওর জেদ। আর কিছু নয়। ফজরের নামাজ আদায় করে ঘুমোতে গেলাম। সকালে উঠে শুনি মেয়ে কিছু খায়নি। রোজা আছে। ভয়ংকর কথা। আবার ভাবলাম কিছুক্ষণ পর ও নিজেই খেয়ে নেবে। তাই কথা বাড়ালাম না। ঠিক চারটা কিংবা সাড়ে চারটার দিকে আমার মেয়ে শুধু একটু পানি খেতে চাচ্ছে। মুখ মলিন। খারাপ লাগছে। কষ্ট হচ্ছে। তবুও সিদ্ধান্ত নিলাম। যেভাবেই হোক এ মাসুম বাচ্চাটার রোজাটা পরিপূর্ণ হোক। তাই মটর সাইকেলে করে ওকে শহরে ঘুরতে বেড়ালাম। আরতো দুইটা ঘন্টা। চিড়িয়াখানা, সুরভী উদ্যান, ঘাঘটের পাড় দেখাতে নিয়ে গেলাম। কিন্ত যেখানেই যাই। সেখানেই ইফতারের দোকান। খাবারের দোকান দেখলেই সে খাবার কিনছে। আমিও এভাবে অনেক ইফতার কিনে ফেললাম। সময় প্রায় কেটেই গেল। বাড়ি ফিরে এলাম। ও একটা বড় প্লেটে সব ইফতার নিয়ে বসলো। একাই খাবে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করছি। যেন মেয়েটা রোজাটা পূর্ণ করে। অবশেষে মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি শুনতে পেলাম। আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর...।

বিসমিল্লাহ্ বলে মেয়েটা এক ঢোঁকে এক গ্লাস শরবত পান করলো। মুখে একটু নাস্তা দিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। বিশাল প্লেটে পড়ে থাকলো সমস্ত ইফতার। আর ঈবাদাহ্ নিজেই বুঝিয়ে দিল ঈবাদাত কী?

করি খুশির ঈদ

চারিদিকে খাবার কত
খেতেই পারি ইচ্ছে যত
থাকি তবু সোজা
ইচ্ছে হলে যেতে পারি
মন্দ কাজের বাড়াবাড়ি
আছি আমি রোজা
দু'হাত তুলি খোদার তরে
দিও তুমি দু'কূল ভরে
ভাল কাজে জড়াও
পাপ করেছি কত শত
চলছি পথ নিজের মত
সরল পথে চলাও
বিশ্ব ভরে করোনা
আমরা মোটেই বড় না
পালিয়ে গেছে নিদ
তুমিই হলে রহমান
সুখটা থাক বহমান
করবো খুশির ঈদ।

রূপম শিকদার

মনের ডায়েরি

ছিঁড়ে ফেলেছি আমার
ডায়েরির সব পাতা,
যেখানেতে লেখা ছিল
হাজারো স্বপ্নের কথা।
ছিঁড়তে পারি নি শুধু
আমার মনের খাতা,
যেখানে জ্বলজ্বল করে
জীবনের যত ব্যথা।
অব্যক্ত সে ব্যথা-ভারে
আমি আজ বড়ো ক্লান্ত,
সে ব্যথার বোঝা নিয়ে
আজ যেন দিক-ভ্রান্ত।
চলে না চরণ তাই,
চক্ষে ঘোরে ধরাতল,
চেপে রাখি কান্না, তবু
আঁখি-পাতা টলমল।

আসল বিশ্বযুদ্ধ

সবাই ছিলাম বিশ্বযুদ্ধের আশায় আশঙ্কায়,
কিন্তু হঠাৎ এ কী দেখি, ভাবতে পরাণ যায়।
এমনই এক ভাইরাস এল, করোনা তার নাম
জগৎজুড়ে সব মানুষের ছুটিয়ে দিলো ঘাম।
এটাই আসল বিশ্বযুদ্ধ, আগের গুলো ফাঁকি,
কয়েকটা দেশ যোগ দিয়েছে, অনেক ছিল বাকি।
এই যুদ্ধের একপক্ষে করোনা ভাইরাস,
গোটা বিশ্বের লোকের মনে ঢুকিয়ে দিল ত্রাস।
অপরপক্ষে সারাজগৎ একসঙ্গে লড়ে,
তা সত্ত্বেও দেশে লক্ষ মানুষ মরে।
ডাক্তার-নার্স, স্বাস্থকর্মী প্রধান সেনাপতি,
সাফাইকর্মী পুলিশ ছাড়া হতো যে দুর্গতি।
একনাগাড়ে লকডাউন চললো কয়েকমাস,
এর পরেও বেড়েই চলছে রোগের করালগ্রাস।
মানুষ হলো ঘরবন্দি, বিপ্লবীদের মতো,
আতঙ্ক আর হতাশাতেও মরছে মানুষ কত?
পরিয়ায়ী শ্রমিক যত, ফিরলো সবাই ঘরে
মরলো কতক পথের মাঝে দুঘর্টনায় পড়ে।
একশো বছর কেউ দেখেনি এমন মহামারী
এটা নিয়েও রাজনৈতিক চাপান-উতোর জারি।
রোগের সাথে লড়তে হবে, রোগীর সাথে নয়,
কঠোর ভাবে মানলে নিয়ম হবেই হবে জয়।।

করোনা

করোনা, তুমি কেন গো এসেছো
এই ধরণীর বুকে?
তোমার জন্য বিশ্ববাসীর
ঘুম তো গিয়েছে চুকে।
করোনা, তুমি নিয়েছো যে কেড়ে
সবার শান্তি-সুখ,
তোমার জন্য আজ বিবর্ণ
মানুষের হাসিমুখ।
স্কুল বা কলেজ, বন্ধ তো সব
যত মন্দির-মঠ,
পরীক্ষা সব স্থগিত, বাতিল
খুলবে কবে এ জট!
লাফিয়ে বাড়ছে জিনিসের দাম,
বন্ধ যানবাহন,
কেউ ঘরে বসে পাচ্ছে বেতন,
কেউ করে অনশন।
চাকরি-বাকরি উঠেছে শিকেয়,
শিক্ষা পায় না দাম,
কেউ পথে বসে দিচ্ছে ধর্ণা,
কারো বা ছুটছে ঘাম।
অক্সিজেন ও টিকা বাড়ন্ত,
প্রতিদিন রোগী বাড়ে,
হাসপাতালেও বেড ফাঁকা নেই,
বাড়িতেই কত মরে।

সেই মরদেহ ঘরে পড়ে পচে,
কে বা করে সৎকার!
এতই ছোঁয়াচে, কেউ নেই কাছে,
কি করুণ দশা তার।

করোনা, তুমি হও গো বিদায়,
নিয়ে সবার যাতনা,
সুদূর আকাশে উড়ে চলে যাও,
করি এই প্রার্থনা।

রূপো বর্মন

ছেলে মানুষ

হ্যাঁ ছেলে মানুষ আমি
আমাকে করতে হবে অনেক কিছু
পড়াশোনা রোজগার আর কতনা কি
হ্যাঁ ছেলে মানুষ আমি
আমার চোখে জল মানায় না
কাঁদলে কাপুরুষত্ব প্রমাণ হবে
লোকে বলবে আমি পুরুষ হওয়ার যোগ্য ছিলাম না
কিন্তু আমিও তো মানুষ
আমারও কষ্ট হয় আমারও ব্যথা লাগে
সেই ছোট্ট বেলা থেকে শুরু হয়েছে কাঁধে বোঝা নেওয়া
প্রথমে ছিল স্কুল ব্যাগ
আর এখনকার ব্যাগ টা বাজারের
স্কুল ব্যাগটা যেমন শিক্ষা দিয়েছে
তেমন বাজারের ব্যাগ টাও শিক্ষা দিচ্ছে
সংসার চালানোর শিক্ষা
তবে ব্যাগটা এখন তেমন ভারী হয় না
কারণ পাঁচ বছর আগে স্কুল আমাকে অবসর দিয়েছে
আর গিন্নিরও বয়স বেড়েছে
তার উপরে আবার দুজনে প্রেসারের রোগী
তাই বিনা চিনিতে চা খেয়ে দিন চলে যায়!

হায়রে গ্যাসট্রিক

জানি রোগ ব্যাধি মানব দেহে সর্বত্র বিরাজমান
কিন্তু তার নামটা সর্বদা বেশি আসে কণ্ঠে
যার জন্য
খেতে পারি না প্রোটিন আর ফাইবারযুক্ত খাবার ইচ্ছে মতো
ভিড় জমাতে পারি না পাঁচমাথা মোরের ওই চপের দোকানে
বিয়ে বাড়িতে যেতে ভয় হয় ঝাল-মশলাদার খাবারের কথা ভেবে
জিভ থেকে লালা ক্ষরণ হলেও মুখে দিতে পারি না ফাস্টফুট
কর্ম ব্যস্ততার মাঝেও স্বাস্থ্যের কদর করি
তবুও অ্যান্টাসিডের ট্যাবলেট গুলো সঙ্গ ছাড়ে না
যথেষ্ট জল খাই টেনশন কমাই ঘুমাই
তবুও আঁকড়ে ধরে স্বস্তি নেয় কেড়ে
হায়রে গ্যাসট্রিক!

প্রিয় আম

তোমাকে হারানোর ভয় মনে থাকে সবসময়
কেন জানো
পড়েছে গ্রীষ্ম ঋতু
এই ঋতুতে আসে কালবৈশাখী ঝড়
যদি সে এসে কেড়ে নিয়ে যায় তোমায়
আমার কাছ থেকে
এতোদিন তোমার আশায় বসে ছিলাম
আজ যখন তুমি কাছে এলে
তবুও তোমায় হারানোর ভয় আমায় কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে
জানিনা তোমায় ধরে রাখতে পারবো কিনা
কিন্তু তুমিও চেষ্টা করো আমার সাথে থাকার
গা ভাসিয়ে দিও না
কালবৈশাখী ঝড়ের সাথে
জানি এই ঋতুতেই তোমার মন মুগ্ধ সুবাস ছড়াবে তুমি সারাবিশ্বে
সুবাস টা ছড়িয়ে দিও
কিন্তু কারো হয়ে যেও না
যতটা কাছে পেয়েছি তোমায়
ততটা কাছেই থাকবো
কোনোদিন আরো কাছে চাই বলে
তোমায় কষ্ট দেবো না
জানি তুমি প্রকৃতির দান
বেশী দিন থাকবে না
তাই তোমার সাথে কাটানো
ক্ষণিকের স্মৃতি গুলোকে ঘিরে

আমি আবারও তোমার অপেক্ষায় বসে থাকবো
তোমাকে দেখে জিভে জল আসলেও
তোমার অঙ্গে রক্তপাত ঝরাবো না
খুব ভালোবাসি তোমায় আমার প্রিয় আম।

ছয় পুরুষ

আমার জীবনে প্রথম পুরুষ এলো
তার সুবাসে ভরা ভালোবাসার মাঝে ছিল
ঝড় বৃষ্টি তপ্ত রোদের আভাস
তবুও আপন করে নিয়েছিলাম তাকে
কারণ তার মাঝে ছিল শুভ নববর্ষের সুর
সে ষাট দিনের মতো ঘর করে চলে গেল
আমার ঘরে দ্বিতীয় পুরুষের প্রবেশ
অতীতের সব ভুলে তার সাথে বেশ কাটছিলো দিন
সোনালী রোদে আলতো বৃষ্টির ছোঁয়া
একহাঁটু জলে কলার ভেলায় ভাসা
দল বেঁধে সবাই মিলে খাল বিলে মাছ ধরতে যাওয়া
জোরালো বৃষ্টির সাথে পুকুরে সাঁতার কাটা
সকাল সকাল আঙিনা ঝাড় দিতে দিতে
তার মিষ্টি প্রেমের ছোঁয়া ভোলা বড় দায়
কিন্তু সেও আট সপ্তাহ থেকে চলে গেল
তৃতীয় পুরুষের চরণ পড়লো আমার আঙিনায়
সে সাজালো আমায় লাল পাড় সাদা শাড়িতে
নূপুর বাঁধানো পায়ে দিলো আলতা পরিয়ে
আমার হাত ধরে হাঁটলো সেই পথে
যেই পথের ধার গুলি কাশফুলে ভরে গেছে
চাঁদনী রাতে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেত আমায়
খুশির সুরে মন্ডপে মন্ডপে
হঠাৎ চারটি পক্ষ যেতে না যেতেই
চতুর্থ পুরুষ এসে আমায় ছিনিয়ে নিল তার কাছে থেকে

সেও ভালোবেসে ছিল আমাকে
তবে পূর্ণিমা রাতে নয় অমাবস্যার অন্ধকারে
একদিন ঘোর অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিয়ে ছিল
বাজি পটকা ফুটিয়ে ছিল আমায় পাওয়ার খুশিতে
নতুন ধানের ভাত খেতে দিয়ে ছিল আমায়ে সে
ভালোবেসে নবান্ন উৎসবে
তখন শুনলাম পঞ্চম পুরুষ ডাকছে আমায়
পিঠে পুলি ক্ষীর আরও নানান স্বাদের খাবার খেতে
আমিও স্বাদের লোভে চতুর্থ পুরুষের সাথে দু মাস ঘর করে
ছুটে চলে গেলাম পঞ্চম পুরুষের কাছে
সব স্বাদের খাবার খেতে দিয়েছিলো আমায় পৌষপার্বণে
কিন্তু আমাকে সবসময় জড়িয়ে ধরে থাকতো সে
তার ছোঁয়ায় যে আমার শরীর বরফ হয়ে যেতো
সেটা কিছুতেই বুঝতে চাইতো না
একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম
হলুদ মাখানো সর্ষে ক্ষেত থেকে
ষষ্ঠ পুরুষ আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে
ও যেন চাইছে
আমাকে হলুদ শাড়ি পরিয়ে খোঁপায় গাঁদা আর পলাশ ফুল গেঁথে
দিতে
সব পুরুষের মতো পঞ্চম পুরুষের সাথেও ঘর করেছিলাম তত দিনই
তারপর রঙিন ভালোবাসার টানে চলে গেলাম ষষ্ঠ পুরুষের কাছে
সে রামধনু রঙে সাজালো আমায়
রাধা কৃষ্ণের মতো রঙ মাখালো অঙ্গে দোল পূর্ণিমার দিনে
নিজের হাতে খাইয়ে দিল তেল পিঠা
চরকের মেলা ঘুরলো আমার হাত ধরে

কিন্তু ফেরার পথে বললো
তুমি এখন বাড়ি যাও
আমি তোমার কাছে আবার ফিরে আসবো দশ মাস পরে
ছাড়তে মন চাইছিলো না আমার প্রিয় বসন্তের হাতটি
কিন্তু আগের পাঁচ পুরুষও তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে
তারাও আসবে আবার দশ মাস পর পর
তাই কষ্ট হলেও বসন্তের হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত যে
আমার ছয় পুরুষ
যাদের সাথে আমি দু মাস করে ঘর করে
বছর টা কাটাই।

শুভজিৎ দাস

সেই জানলাটা আজও বন্ধ

সেই জানলাটা আজও বন্ধ!
জানলার চটে যাওয়া রং-এ গুঁড়ো গুলো আজ হাতছানি দিয়ে
বাতাসকে ডাকছে।
এই জানলাটা এখনও কেন বন্ধ,
এই প্রশ্নবানে বিদ্ধ করে তারা হা করে তাকিয়ে থাকে আর জানলার
কপাটে লাগানো বিজ্ঞাপনকে গিলে তারপর আকাশের দিকে তাকাতে
তাকাতে এক কানাগলির দিকে চলে যায় ।

কেটে গেল ১৯৪৭,
কেটে গেল ১৯৭৫ এর বিভীষিকা,
ঘরহীন উল্লঙ্গ হাভাতেরা তখনও তাকাত এই জানলাটা খুলবে হয়তো!
বয়ে যাচ্ছে বিশের বিভীষিকা,
মলীন পোশাক পরে সেদিন সেই লোকটাও
আজ আর অবাক হলো না এই বন্ধ জানলা দেখে,
শুধু মনে মনে ভাবল
‘জানলাটা আজও বন্ধ?’

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

যোগ-বিয়োগ

(এক)

আজ সকালে ঘুম ভেঙে অভীক দেখল যে সুতৃপ্তি আগেই উঠে গেছে। রান্নাঘরে টুংটাং শব্দে বুঝল যে একটু পরেই চা আসছে। সুতৃপ্তিকে বিয়ের আগে থেকেই ও জানতো যে ওর বউ আর্লি রাইজার নয়। তাহলে এই রোববার সাত-তাড়াতাড়ি উঠে চা বানাতে কেন উঠল?

অভীক মুখহাত ধুয়ে রান্নাঘরে গেল। গ্যাসে তখন চা ফুটতে ফুটতে কালো হয়ে গেছে আর সুতৃপ্তি স্থাণুর মত সেটাই একমনে দেখছে।

ও যেন একটা পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে।

অভীক ওকে ডাকলনা। বরং গ্যাস বন্ধ করে দিয়ে নিঃশব্দে গিয়ে বউকে বুকে জড়িয়ে ধরল।
সুতৃপ্তি তখন যেন কোন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। অভীকের আলিঙ্গনেও সেটা কাটলো না।

এই অসুখটা তো আর নতুন নয়। এটা আসলে নিউরোট্রান্সমিটার ইমব্যালেন্স। এই রোগটাই যে এমন। অভীককে মাঝেমাঝে ও চিনতেও পারেনা তবুও অভীক ওর যত্ন নেয় আগের মতোই। সুতৃপ্তিকে ছাড়া যে ওর কাউকেই ভালো লাগেনা আর।

অভীক আর সুতৃপ্তির অনেকদিনের রিলেশান। কলেজজীবনের থেকেই। তবে ওরা অবশ্য দ্বিতীয়বার এক সাথে থাকার সুযোগ পেয়েছে এই

সবে ক'মাস হলো। আড়াই বছরের বিবাহিত জীবনের শেষে অনিবার্য সেই ডিভোর্সের পর অভীক বিনাবাক্যব্যয়ে সুতৃপ্তির কাছেই ফিরে আসে।
দুজনের জীবনে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ আসলে শেষ হয়নি বলে ওরা যেন জানত মিলতে ওদের সেই হবেই।

আসলে সুতৃপ্তি তখন মিসক্যারেজের পর পাগল পাগল অবস্থা।এর ওপর ওর হাসবেন্ড তখন আবার ডিভোর্সের মামলাও করেছে।
অভীক নিজেও দু দন্ড ওকে শান্তি দিতেই সঙ্গে নিজেও বিবাহবিচ্ছেদের পর একাই যখন জীবনকে আবার গুছিয়ে নিতেই নাজেহাল ঠিক তখনই স্থির করে সুতৃপ্তিকে নিয়েই পথ চলবে আবার নতুন উদ্যমে।
আসলে সময়ে সব কিছু হলে ওরা নিজেদেরকে হয়ত আর একটু স্থিতি দিতে পারতো।

(দুই)

ভোরবেলাটায় অবশ্য দেখতে বেশ ভালোই লাগে চারপাশটাকে। সুতৃপ্তি এখন কথা টথা বন্ধ করে ঠকঠক করে কাঁপছে। এই পর্বটা এখন অনেকক্ষণ চলবে মনে হচ্ছে। মেন্টাল স্ট্রেসের এই সময়টা ও চায় আরো বেশী করে সুতৃপ্তিকে জাপটে রাখতে। মেয়েটার জীবনে একজন আসল বন্ধুর অভাবটাই নিজে বোঝে ও। তাই তো স্বামীর চেয়ে বন্ধুভাবেই বেশী থাকে অভীক। বিগতজীবনকে নিয়ে বেচারার ট্রমাটা এখনো কাটেনি। এই জীবনে তো আবার নতুন করে পাওয়াটাই তো আসল হলেও বিগত জীবন অকারণ তাড়া করে ফেরে। আবার সবকিছু বোধহয় একেবারে হারিয়ে যায় না।

অভীক আর ওর স্ত্রী অপর্ণার জীবনটা সেই ভালোবাসা আর অধিকারের লড়াইয়ের জেরেই ভেঙে গেল। অভীকের চাকরি, অফিসে কাজের জন্য

লেট নাইট আর ঘরের মধ্যে চিরন্তন বিবাদ ওকে আবার সুতৃপ্তির কাছে একদিন দাঁড় করিয়ে দিল যেখান থেকেই জীবনটাকে ও একদিন দেখতে শিখেছিল।

ডাক্তার সেন কিন্তু বেশ গম্ভীর। আসলে এই রোগেতে Serotonin, Dopamine এইরকম নিউরো হরমোন যা স্ট্রেস ম্যানেজ করে ও দেহকে সুস্থ রাখে যখন অতিরিক্ত ক্ষরণের কারণে আর তৈরী হতে পারে না তখন ওই সাংঘাতিক ডিপ্রেসন এবং অন্তরের ক্ষয় হয়।

তাই জন্য এখন সুতৃপ্তির মনের এই অসুখ বাড়ছে শুধু নয় মস্তিষ্কের ভালো কোষগুলোতেও রোগের বীজ ধীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে। অভীক নিজে যথেষ্ট আশাবাদী যে শিগগিরই সুতৃপ্তি সেরে উঠবেই। এমনিতে ওকে দেখলে এসব কিছুই প্রকাশ পাবেনা কিন্তু গাঢ়তর বিচ্ছেদবোধ তাড়িয়ে বেড়ায় অনন্তকাল জুড়ে। অভীক কিন্তু সুতৃপ্তিকে নিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাসপাতালে যেতে আজ রাজী। কিন্তু কেউ কি ওকে সারিয়ে দেবে? সেটার উত্তরটাই অজানা এখনো।

নার্স বলল এখুনি একবার তাড়াতাড়ি আসতে। আসলে চ্যানেল ব্লাড নিলেও একঘন্টায় ওটা কিছুই ফ্লো করেনি। ওরা এখন অক্সিজেন কানেকশন রেডি করার আগে ওর অনুমতি চাইছে। অভীকের মাথা তখন আর কাজ করছে না। অভীক তাড়াতাড়ি ফর্মে সই করে দেয় তখুনি।

(তিন)

একটা গোলাপী রংএর আলো এসে ঘুরপাক খাচ্ছে এখন। সবুজ গালচের মত ঘাস যেন পা ফেলতে ডাকছে। সুতৃপ্তি যেন ছোট্ট বাচ্চা

হয়ে গেছে। সে এলোমেলো পায়ে এগিয়ে এসে অভীকের পকেট ধরে ডাকছে।

কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে এখন। কোন কষ্টই আর নেই। যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্নের মতন খানিকটা। সুতৃপ্তির নিজের খুব ভাল লাগছে এখন।
সব যন্ত্রণা কি করে যেন চলেই গেছে শরীর থেকে। খুব অভীককে দেখতে ইচ্ছে করছে আগের মত। কিন্তু সব যে....

ফুলের মত মেয়েটা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে কি নির্লিপ্ত এক ভঙ্গীতে। ওর বোজা ওই দু চোখে সেই ফেলে আসা না দেখা স্বপ্নের ঘোর জড়িয়ে আছে।

অভীক তার জীবনের চিরাচরিত ওই হিসেবের পর তৃতীয়বার মনে মনেই সুতৃপ্তির সেই অটুট সঙ্গটাকেই পাওয়ার অপেক্ষাতেই থাকবে অন্তহীন এক অপেক্ষায়।

ইস্কুল ব্যাগ

বাজারে আসলে নিত্যনতুন বায়না আফসানার। কখনো পুতুল, কখনো খেলনাবাটি এসবের অপর্যাপ্ত সম্রাজ্ঞী হয়েও তার আশ মেটে না। হিমসিম খায় নাজিয়া মাঝে মধ্যে। সামনে ঈদ তার জন্য ভালো সিমাই কিনতে নবাবগঞ্জের হাটে আজ আসা। আফসানা সিমাই খেতে ভালবাসে খুব। ওর বাবা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে সুরাটে। ছ'মাসে একবার বাড়ি আসে আব্বাস। বেটী খুবই বাপ সোহাগী। আব্বু বাড়ীতে আসলে তার মজা দেখে কে। নাজিয়াও আব্বাসের নয়নের মণি। তাদের গরীবের সংসারে হাসি আর অভাব আলো হয়ে জ্বলে থাকে মলিনতা উপেক্ষা করেই।

এবার একটা ইস্কুল ব্যাগের বায়না তার। ভারী সুন্দর দেখতে অনেক কটা খোপওয়ালা। দামটা বেশী তিনশ টাকা। নাজিয়ার সংসারে তা বড্ড বেশীই সেটা কি আর আফসানাকে বোঝানো যায়!

কোনওমতে সিমাই কিনে ঘরমুখী হয় তারা। এবারে ঈদের দুদিন আগে জন্মদিন পড়েছে আফসানার। এতে সে ডবল খুশী। সিমাই এর সাথে জামাও হবে একটা বেশি, সেটা জন্মদিন বলেই।
গোটা রমজান মাসের পর ঈদ আসছে মহল্লায় খুশীর চাঁদের নখের ফালির মতই আনন্দ আর আল্লাহর রহমৎ কে সঙ্গে করেই।

আফসানা ইস্কুল চলে গেলে নাজিয়া ঘর থেকে বাজারে যায়। মেয়েকে চমক দিতেই ওই ইস্কুল ব্যাগটা কিনে আনে। শেষ পর্যন্ত আড়াইশতেই হাতে আসে খুশী আর চমকের সমারোহে।

ঘুম থেকে উঠে মাথার কাছে রাখা মোড়ক খোলে আফসানা। রেশমী বুটিদার ফ্রকের সাথে সেই সাধের ব্যাগখানা। আব্বুর ফোন আসে সাথে সাথেই। আদরে আর আনন্দে গলে যায় সে। নাজিয়া দোয়া চায় অফুরন্ত আয়ু আর সুস্থতার। খুশীর ঝলক চলকে ওঠে ছোট্ট সংসারের গৃহস্থী জুড়ে।

নতুন ব্যাগ নিয়ে ইস্কুলে চলে যায় আফসানা। আজ বন্ধুরা অবাক হয়ে যাবে ওর ব্যাগখানা দেখে!
যথাসময়ে শুরু হয় প্রার্থনাসঙ্গীত।
প্রকৃতি বিরূপ হয় সহসা। বহুযুগের আলোড়ন উঠে আসে মাটির ভিতর থেকে। বন্দী দৈত্যের ঘুম ভাঙে তীব্র কম্পনে। প্রাইমারী স্কুলের বাড়ি ধ্বসে পড়ে এই তীব্র ভূকম্পনে। বাচ্চাগুলো হদিস মেলা কঠিন হয়ে যায় ধ্বংসস্তুপের ভিতর থেকে। অসংখ্য আর্তনাদ চাপা পড়ে যায় ইট কাঠ কংক্রিটের তলায়।
উদ্ধারকারীর দল কাজ শুরু করতে করতে অর্ধেক শিশু শান্ত হয়ে গেছে প্রকৃতির রিরংসায়। নাজিয়াদের বাড়ির একটা দিকও ধ্বসে গেছে এই কম্পনে। কোনও মতে সে যখন ইস্কুলবাড়ির পথে দৌড়ায় তাকে আটকায় করিমচাচা সঙ্গে মিলিটারী পোশাকের একটা লোক। ওর হাতে ধরিয়ে দেয় আফসানার সেই নতুন ইস্কুল ব্যাগ রক্তলাঞ্ছিত আর শতচ্ছিন্ন সেটি। ওখানেই পাথর হয়ে যায় নাজিয়া, কথা জোগায় না মুখে।

আজ ঈদ অবশেষে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে দু এক ঘরে টুনি বাল্ব আর নিশান লেগেছে। রমজানী সাঁঝের ডালের বড়ার গন্ধ ভেসে আসছে ইতিউতি। চাঁদও উঠেছে একফালি নিয়ম মেনেও। তবে এবারে আলোটা রূপোলী নয় যেন, লালচে।

আনন্দস্বরূপা

আর একদিন পর থেকেই এ বৎসরের মতো কার্তিকী কৃষ্ণপক্ষের শুরু। আর সেই রোরুদ্যমানা ভয়াল অন্ধকারেই আসন্ন বহুকাঙ্খিত দীপাবলির মহাপূজার ক্ষণটি।

এর একটি মাস আগে থেকেই পিতৃলোকের আরাধ্য দেহাত্মাগণ তাঁদের বংশজদের উত্তরণ ঘটাতে এই মর্ত্যভূমিতে অবতরণ করেন আর তাদের হাতে তিলাঞ্জলির পিপাসা নিবারণের পর বংশধরদের ইহজীবনটি ধন্য করেন। এবারে কিন্তু মাসাধিককালের অন্তে তাঁদের উন্মার্গগমনের সেই পরম সময়টি ক্রমেই যে উপস্থিত তা তো আর কারো অজানা নয়!

মধ্যরাত এখন অতিক্রান্ত। বাতাসে কার্তিকের ঈষৎ শৈত্য মৃদুমন্দ আভাসে জানিয়ে দিচ্ছে এবারে আদিত্যদেবের অতিপরিচিত সেই দক্ষিণায়ণটির ক্রমপ্রাবল্য।

এদিকে এক পর্ণকুটিরের সামনে সুরধ্বনিময় গঙ্গার বুকে কান পাতলে ক্রমে আবার যেমন একটি নতুন জোয়ারস্রোতের কলস্বর শোনা যাচ্ছে বটে আবার সেই গৃহকর্তাটি অন্য রাতগুলির মত এ রাতেও একেবারে বিস্রস্ত, সুপ্তিহীন, বিনিদ্র ও অটলগম্ভীর। মহানিশার এই বিছানায় সুষুপ্ত সব প্রতিবেশী আর পরিবারের লোকজনদের কথা বরং আজ থাক।

এখন আমাদের ওই গৃহকর্তা স্বয়ং কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে নিয়েই ক্রমে অগ্রসর হওয়াই ভাল।

একদা তিনিও নবদ্বীপরত্ন শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী ছিলেন বলে শ্লাঘা বোধ করেন। যদিও সে মহাযুগ এখন ইতিহাসের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে, যখন তিনি, রঘুনন্দন শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ও শ্রী গৌর একই টোলে নানা জটিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন আর বহু তাত্ত্বিক বিতর্ক বাঁধিয়ে তাবড় সব পূর্বতন নৈয়ায়িকদের দর্পচূর্ণ করতেন এই শান্তিপুর-নবদ্বীপে অবস্থান করে। চোখ বুজলে এককালে যে তাঁরও সেই বহ্নিসদৃশ কিশোর গৌরহরির মধ্যে যে একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল তা যেন আজও বিস্মরণে তিনি অক্ষম।

পরবর্তীকালে তাঁর সতীর্থটি বৃন্দাবনাশ্রিত সখীভাবে কৃষ্ণভজনের পথে গেলে, দুজনের মধ্যে আদর্শগত মনোমালিন্য হয় ও কৃষ্ণানন্দ তখন শাক্ত পথ অবলম্বন করেন। অবশ্য প্রিয়বন্ধু গৌরের এই নতুন শ্রীচৈতন্যরূপটি যদিও তিনি একদা রামকেলীর আসরে দূর থেকে একবার দেখে অশ্রুমার্জনা করে নীরবে ক্ষমা চেয়ে এসেছেন নিজে, শেষ পর্যন্ত দূরবর্তী দর্শকের আসন থেকেই।

গত নিশাকালটি মনোরম হলেও তিনি এখন বড়ো উতলা। তিনি আসলে মনের মধ্যে কেবল খুঁজে চলেছেন নিভৃত সমর্পণের আদর্শ সেই পরমআরাধ্যা অতিগূহ্য চিন্ময়ীর মাতৃস্বরূপটি।

যা বহু কঠিন শাস্ত্রমন্থনেও সেই রূপটি যে এখনো তাঁর নিজেরই অধরা।

আসলে চৈতন্য-পরবর্তী যুগে, যখন ধীরে-ধীরে বৈষ্ণব-আধিপত্য কমে আসছে স্বয়ং ভিত্তিভূমি নবদ্বীপে, তেমনই এক সময়ে সাধক হিসাবে আত্মবিকাশ "আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দে"র।

বাংলায় শক্তিচর্চাও তখন বিক্ষিপ্ত, অধোগামী। হাল ধরতে এলেন আগম-নির্গম সব তন্ত্রের সারাৎসার যাঁর ধমনীর মধ্যে সেই তিনিই। বিভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্র ঘেঁটে, রচনা করলেন 'তন্ত্রসার'। লোকে তখন থেকেই "আগমবাগীশ" বলে তাঁর কাছে গুরুজ্ঞানে প্রণত হয়।

কিন্তু মেজাজটি আর সাধকোচিত বশে নেই। থেকে থেকেই অকারণ অস্থির লাগছে বড়োই। স্বয়ং চিদানন্দস্বরূপা রূপপ্রকাশের খেলাটিতে কি তবে সত্যিই তাঁর প্রতি নিছক অনুদার?

মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হয় এযাবৎ চর্চিত সেই শাস্ত্রবাক্যগুলি। আজ অজানিতেই সেগুলিকে সর্বতঃ ব্যর্থ বলেই তবে কেন মনে হচ্ছে কৃষ্ণানন্দের?

একটু ধীরগতিতে এসে তিনি সেই পূণ্যসলিলা গঙ্গোদকে পাদস্পর্শ করলেন। তারপর কিঞ্চিৎ স্বচ্ছতোয়ার ধারা হাতে তুলে এবার যেন নিজের মাথায় ছিটিয়ে আত্মশুদ্ধি করলেন।

নাহ্ ! তাঁর যে আর আজকাল নিদ্রাই যে আর আসেনা। অথচ স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী ব্রাহ্মপ্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পরই তো সেই কাঙ্খিত মাতৃমূর্তিটি প্রকট হওয়ার কথা। তারই প্রলোভনে যে কত রাত তিনি বিনিদ্র আর অপেক্ষমান সেটা আর কাকেই বা তিনি বলবেন?

শাক্ত তন্ত্রে এখনো পর্যন্ত মহাশক্তিযন্ত্র ও ঘটে আরাধনা হলেও দেবীর মাতৃস্বরূপটি সবারই অজানা। স্বয়ং তিনিও কি পারবেন এতদিনপরে সেই অভ্রংলিহ কারুণিকের দেবীরূপটিকে একবার চাক্ষুষ করতে?

পূবদিকে শেষরাতের মায়াময় স্নিগ্ধতা কাটিয়ে এবার অরুণোদয় ক্রমআসন্ন। এ যেন আরও একটি ব্যর্থতম দিনের উদ্ভাস !

হায়! আক্ষেপ করে ওঠেন সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। গত পক্ষকালের মত এই রাত্রিটিও বিফল হল তবে!

নিরন্তর তন্ত্রসাধনায় তিনি বুঝেছেন যে সাধারণ মানুষ নিরাকারের পূজা ও তার মর্ম সঠিকভাবে বুঝবে না। অতএব মৃণ্ময়ী মূর্তিতেই এবারে হোক দেবীর আরাধ্যা রূপের প্রকাশ।

ঈষৎ মনস্তাপের সাথে তিনি নবোদিত সদ্যোজাত ক্ষীণ রশ্মিসম্পন্ন সূর্যকে অভ্যাস মতো একবার প্রণাম করলেন। তারপর আচমনের জন্য সামান্য জল তাঁর কণ্ঠস্পর্শ করল সভক্তিভরেই।

তাহলে! সেই ছদ্মরূপা মহাশক্তি আজও তবে তাঁর কাছে ধরা দিলেন না ! আর একপক্ষকাল পরেই তো অমাবস্যা। দেবী ভগবতী কি তার আগে একটুও এই অধমসাধকটির ওপর সদয়া হতে পারেন না?

মধ্যবয়স্ক বৃষস্কন্ধ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্থির করলেন এবারে এই ব্যর্থ অসহায় মনুষ্য দেহটিকে তবে না হয় এজন্মের মত সেই মুক্তকেশী করালবদনাকেই নিজের হাতে প্রণামীর জন্য দিয়ে আসবেন আগামী মহাপূজার শেষে, অমাবস্যাটি বিগত হলেই।

তন্ময় সাধকের পথে হঠাৎই গোচর হয় এক নিম্নবর্ণীয়া গোপবধূ। তার ডান পা একটি বারান্দার ওপর তোলা, আর বাঁ পা মাটিতে। ডান হাতে

তার কিছু গোময়ের স্তুপ আর বাম হাতটি উঁচুতে তুলে ঘুঁটে দিতে সে এখন উদ্যত সীমানার বেড়াটির গায়ে।

রমণীটির কুঞ্চিত মেঘকালো চুলটি আলুলায়িত ও খোলা, যদিও পরণে তার কোনওভাবে পরিধান করা একটি ছোট শাড়ি তবুও সেই শ্যামবর্ণা প্রায় প্রায়উলঙ্গিনী পরমাপ্রকৃতিটি অত ভোরে স্বয়ং কৃষ্ণানন্দকে দেখে লজ্জায় জিভটি কেটে আবার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন ফিরে দাঁড়াল।

কৃষ্ণানন্দ স্বয়ং এ দৃশ্যে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

কিন্তু কে যেন অলক্ষ্যে বসে তাঁর প্রতি অট্টহাস্য করে বিদ্রুপ করে বলছে- ”রে মূর্খ! এই তো সেই আরাধ্যা চিন্ময়ী স্বরূপা রে! যার ধ্যানে বসলে তুই নিজেই মুগ্ধকণ্ঠে বলিস্ তো,

- ঘোরদ্রংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।। শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাম্।।

ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।

বালার্ক মণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্।।

দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-লম্বমান কচোচ্চয়াম্। শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরিসংস্থিতাম্।।

শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমান্বিতাম্। মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাম্।।সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্।

এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধিদাম্”

হঠাৎ তাঁর মনোজগতে এক অসীমপরিবর্তন ধেয়ে আসছে যেন। কৃষ্ণানন্দের মুখের স্মিত হাসিতে এখন বিশ্বজয়ী সাধকপ্রবরের এক নবঅনুরাগের ক্রমউন্মেষ।

আহা! এই তো সেই বহুপ্রতীক্ষিত তাঁর মাতৃকার চিন্ময়ী আনন্দস্বরূপার স্বরূপটি। রূপকের আড়ালে যিনি তো সদাই ভক্তকল্পতরু।

ধন্য আজ নিশাবসান! আর তদ্বজনিত প্রকাশমানা আজকের পরম ব্রাহ্মমুহূর্তকালটি!

তাঁর দুটি চোখে ততোক্ষণে নেমে এসেছে ভক্তির অশ্রুধারা। বিগলিত কণ্ঠে সুরধ্বনীর তীরে শুয়ে আভূমি প্রণত হন তিনি, আর মন্দ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেন দক্ষিণাকালিকার প্রতি পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের সময়ে সেই বহুচর্চিত ও উচ্চারিত মহামন্ত্রটি –

“আয়ুর্দ্দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহিমে।পুত্রান্ দেহি ধনংদেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহিমে।। দুর্গোত্তারাণি দুর্গে ত্বাং সর্ব্বাশুভ-নিবারিণি। ধর্ম্মার্থমোক্ষদে দেবি নিত্যং মে বরদা ভয়।। কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি। ধর্ম্মকামপ্রদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে।।”

বেশ অভাবনীয়ভাবেই স্বয়ং চিন্ময়ীকে আজ প্রত্যক্ষ করেছেন শেষপর্যন্ত। এবারে কালাকালের ভাবতরঙ্গে সেই রূপটিকেই ভবিষ্যতের জন্য মৃন্ময়ী

আকার দিয়ে যেতে হবে। তাঁর আয়ুষ্কালটি এবার গত হলেও এই রূপেই দেবী চিরদিন ধরা থাকবেন।

আগমবাগীশের ঐশী সাধনার শেষপর্বটি আজ বড়োই যে মধুর সমাপনে চিরউজ্জ্বল হয়ে রইল।

বিগলিত কৃষ্ণানন্দ অবশেষে সানন্দে আজ তাঁর কুটিরের পথে পা বাড়ালেন।

আমার সাধ না মিটিল

১৭ নম্বর বটকৃষ্ণ পাল এ্যাভিনিউর হলদে ছোপধরা বাড়িটার বেশ বয়স হয়েছে। তিনপুরুষের মুখোপাধ্যায়দের বসত ভিটে। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় নিমকমহলের দেওয়ানী করতেন রামকমল মুখুজ্যে। তারপর সাহেবদের ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট হয়ে বেশ অর্থ সম্পদের অধিকারী হয়ে এই ভদ্রাসনটির পত্তন করেন। তারপরের পুরুষ তারাচাঁদ মুখুজ্যে বেঙ্গল থিয়েটারে টাকা ঢেলে ফতুর হয়ে যান প্রায়। সেই থেকে প্রথম এ বাড়িতে গান বাজনা ঢোকে। তারাচাঁদের রক্ষিতা ছিলেন মানময়ী দাসী। সেসময়ের নাম করা এ্যাকট্রেস। কুসুমকুমারীর সাথে টক্কর দিতেন। তাঁর কীর্তনাঙ্গের গানে ছিল ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভা। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর ওঁকেই বিবাহ করেন স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তনী তারাচাঁদ আর এই পৈতৃক ভদ্রাসনে স্থান দেন। সে নিয়ে বিস্তর কেচ্ছা কাহিনী এই বাড়ির শিকড় বাকড়ে এখনো কান পাতলে শুনতে পাওয়া যায়। তারাচাঁদের পর নামকরা উকিল যুগলকিশোর মুখুজ্যে আর সেই শাখায় দুটি সন্তান মৃত্যুঞ্জয় আর প্রাণকৃষ্ণ। আজ এঁরা দুজনেই প্রতিষ্ঠিত গায়ক। আসর, রেডিও, জলসা সবেতে মৃত্যুঞ্জয়েরই ডাক আসে বেশী। আজকাল তো ফিল্মেও গাইছেন। আধুনিক গানের তাঁর বেসিক রেকর্ডগুলোর ভালোই বিক্রি এছাড়া টপ্পা আর ভক্তিগীতিও তাঁর কণ্ঠে বেশ জনপ্রিয়। প্রাণকৃষ্ণ অবশ্য আরো উচ্চমানের গায়ক হতে পারতেন। গলাও তাঁর বেশী ভাল, একটু চিকন -মিহি, চড়া পর্দার আরোহণেও স্বর স্বাভাবিক থাকে। ওস্তাদ আসাদ খাঁর কাছে খেয়ালেরও তালিম নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি স্বভাবে কুণ্ঠিত ভীরু স্বভাবের মানুষ। একটু নিভৃতচারণপ্রিয়। সেজন্য আজও জনপ্রিয়তা পেলেও অগ্রজের থেকে সামান্য পিছিয়ে আছেন ঠিকই; তবে একটি প্রকার ঐশ্বর্য তাঁরও আছে যা বোধহয় মানময়ী দাসীর উত্তরধারার ক্ষীণরক্তধারা বাহিত।

শ্যামাসঙ্গীত আর কীর্তনে তিনি একচ্ছত্র সম্রাট। ভক্তিগীতির এই ধারাটিতে তিনি যে মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে হারিয়ে দিয়েছেন এটা বাংলার মানুষও মানে।

রোববারের সকালবেলা লুচি বেগুনভাজা আর সুজির হালুয়া এ বাড়ির জলখাবারে বাঁধা। এখন এ পরিবারের কর্তা মৃত্যুঞ্জয় বাবু ই। ফর্সা রাশভারী চেহারা। চোখের সোনালী হাফ রিমের চশমাটা হাল ফ্যাশানের হলেও এ বাড়ির পুরুষরা এখনো ধূতি ফতুয়া ত্যাগ করেন নি। সত্তরের দশকে টেরিলিন বলে একধরণের কাপড় বোম্বাই ফিল্মের দেখাদেখি ছেলে ছোকরারা পড়লেও ওনার নিজের সাবেকী পোশাকই পছন্দ। লুচির টুকরোটা ছিঁড়ে মুখে পুরতে পুরতে বললেন, ‘ পানু কোথায় ! এখনো ওঠেনি বুঝি?’ স্ত্রী নীপময়ী বলেন ‘ না ! ঠাকুরপোদের ঘরের দরজা বন্ধ এখনো ! উঠবে এবার ! ‘ মৃত্যুঞ্জয় স্বগতোক্তি করেন, ‘পানু টা আর একটু সিরিয়াস হলে আরও নাম করতে পারত। ওর ভক্তিগীতি লোকে ভালবাসে বলে আমি তো আজকাল দু একটা ছাড়া গাওয়া ছেড়েই দিয়েছি ! কিসের ঘোরে যে ও সর্বদা থাকে ! মা গঙ্গাই জানেন !’

প্রাণকৃষ্ণ রেডিওর অফিস থেকে বেরিয়ে একটা ট্রাম দেখতে পেয়েই উঠে গেল। এখন কোথায় যাওয়া যায় ! এই ট্রামটা মনে হয় কালীঘাট ডিপো অবধি যাবে। পকেটে দুবারের আসাযাওয়ার পয়সা রুম্পা রেখে দিয়েছে ঠিক। নিজের ওসবের খেয়াল রাখার দায় নেই। বাকী সব কিছুতেই মাথার ওপর দাদা তো আছেনই। আজকের গানটা ভালো জমেনি। রজনীকান্তের ‘আমি সকল কাজের পাই যে সময়’ ওর নিজের খুবই প্রিয় গান । কিন্তু আজ যেন সুরে তালে জমল না। কেউ সেটা ধরতে পারেনি যদিও, কিন্তু ও নিজে জানে। রেডিওতে গান রেকর্ডিং থাকলে বীরেনদাও আসেন। চুপ করে গান শোনেন নস্যির কৌটো হাতে

স্থির হয়ে। দু একবার বীরেনদার চোখে চিকচিকে জলও দেখেছে যেন। ট্রামটা কালীঘাট ব্রিজের কাছে আসতেই টুক করে নেমে যেতে হবে।

নাটমন্দির থেকে দুটো চক্কর দিয়ে ওপারের পথ ধরল প্রাণকৃষ্ণ। ওদিকে কেওড়াতলা। ওখানটায় যেতেই খুব মন টানে আজকাল। দুপুরবেলাটা একটু নির্জন থাকে একটা ঝুপসি বটতলা। ওখানে চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছা হয়। চিতার আগুনে ফট্ ফট্ শব্দ হয়। চামড়া পোড়া গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে থাকে। মনটা খুব হু হু করে ওঠে কেমন। চিতা কাঠ গুলো কি তবে ওকে ডাকে?

বিডনস্ট্রীটের নবরাগ সঙ্ঘের সেক্রেটারি মাখন বাবু আর তাঁর অনুচর কিঙ্কর এখন বৈঠকখানায় বসে। বিজয়া সম্মিলনীতে ওদের মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে চাই। সম্প্রতি একটা বাংলা ছবি জুবিলি করেছে। তার সবচেয়ে হিট গানটা আবার ওনারই গাওয়া। এজন্য বেশ মোটা অঙ্কের টাকা অফার করতেও ওরা রাজী। বম্বে থেকে আরেক জন নামজাদা বাঙালি গায়ক উনিও উত্তর কোলকাতারই ছেলে তাঁকেও এবার আনছে নবরাগ সঙ্ঘ। কেবল আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটি ক্লাবকে টেক্কা দিতে হবে এবার। ওরা হেমেনবাবুকে অলরেডি বুক করে রেখেছে। হেমেন মৃত্যুঞ্জয়ের বন্ধুস্থানীয়। দুজনেই দুজনার গুণগ্রাহী।

মৃত্যুঞ্জয় বাবু রাজী হলেন কেবল একটি শর্তে। একঘন্টার একটা স্লটে প্রাণকৃষ্ণও গাইবেন একক শ্যামাসঙ্গীত। তার জন্য আলাদা পয়সা দিতে হবেনা। উনি নিজে হাজার টাকা কমেই গেয়ে দেবেন, বাকীটা ভাই এর সাম্মানিক হিসাবে দিতে হবে।

এরমধ্যে পূজোয় আর একটা রেকর্ড বেরিয়েছে প্রাণকৃষ্ণর। ‘ মায়ের পায়ের জবা ‘ র বিক্রির রিপোর্ট মোটামুটি ভালই। চারটি গান দুটি পিঠ মিলিয়ে। এরমধ্যে ‘ আমার সাধ না মিটিল ‘- টাই বেশী হিট হয়েছে।

আজকাল আসরগুলোতে এই গানটা গাইতেই হচ্ছে। নবরাগ সঙ্ঘেও এই গানটারই দুবার এনকোর কল এল। শেষে সবমিলিয়ে দুহাজার টাকা প্রাপ্তিযোগ। রুম্পার হাতে এসে টাকার খামটা তুলে দিয়ে একটু হাসিমুখে তাকাল ও। রুম্পার প্রতি অবহেলা করতে মন চায়না মোটেও, তবুও কি করে যেন সব গন্ডগোল হয়ে যায়! দাদা বৌদিই পাত্রী পছন্দ করে এনে বিয়েটা দিয়েছিল। ধনিয়াখালীর কাছে শ্বশুরবাড়ি ওর। যদিও বিয়ের পর আর নিজে যায়নি দ্বিতীয় বার। তিন বছরে দুটি পুত্রের জনক হয়েছে প্রাণকৃষ্ণ। তারা আবার পিঠোপিঠিই জন্মেছে। দাদা বৌদির ওরা নয়নের মণি। ষোল বছর আগে দাদার বিয়ে হলেও এবাড়িতে সন্তান শুধু প্রাণকৃষ্ণেরই। রুম্পা একটু রুগ্ন স্বাস্থের।বউদি তাই রুম্পার ওপর সংসারের অহেতুক ভার চাপায় নি কখনো সহমর্মী হয়েই।

সন্ধ্যের পর প্রাণকৃষ্ণ আজ গায়ে ঘুষঘুষে জ্বর নিয়েই বাড়ি থেকে বের হলো। নিমতলা শ্মশানের গায়ে ভূতেশ্বরের মন্দিরের আশপাশটা গাঁজার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন । পূজো শেষ, বেশ শিরশিরে একটা হাওয়া এদিকটায়। ও শ্মশানের ভিতরে গিয়ে বসলো। আজকাল যে কোন শ্মশানই ওকে খুব টানে। নিমতলার এদিকটায় মড়ার খাটগুলো একদিকে স্তুপ করা, ফুল, মালা, তোষকগুলোও ডাঁই করা। আজকে অবাক কান্ড এখন কোনও চিতা জ্বলছে না। কিছু পোড়া কাঠ ইতঃস্তত ভাবে তাকিয়ে আছে কালাকালের উদ্ধারিণী গঙ্গার দিকে। কয়েকটা তার মধ্যে ভাসছেও। এসবই ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে এক অতীন্দ্রিয় জগতে। কানে কানে অজস্র মৃত্যু যেন ফিসফিস করে কথা বলে যায়। তার মধ্যেই কখনো কখনো একটা জ্যোর্তিবলয়ের মধ্যে ত্রিনয়ন জ্বলজ্বল করে। ঘোর তামসী রূপ, কিন্তু না তাকিয়ে পারা যায় না কোনওমতেই। চারপাশের জগতটা তুচ্ছ হয়ে যায় তখন। এরই মধ্যে হঠাৎ হরিধ্বনি দিতে দিতে একটা মড়া এলো। একজন ডোম মদ খেয়ে টলছে। সেই টলতে টলতে চিতার

সরঞ্জাম জোগাড় করতে গেল। মৃতদেহটি একজন কমবয়েসী সধবা মহিলার। বড়জোড় পঁচিশ ছাব্বিশ হবে। চওড়া পাড়ের লাল শাড়ি আর একমাথা লাল টকটকে সিঁদূরে কি বীভৎস লাগছে। প্রাণকৃষ্ণ উঠে পড়তে চাইল। কিন্তু সেই মৃতা নারীর মুখটা কিছুতেই চোখের সামনে থেকে যাচ্ছে না। কোথায় যেন দেখেছে সে এই একই মুখ? দূর থেকে আসা একরাশ নীলাভ আলোর তরঙ্গে নেচে নেচে ভেসে আসছে সেই ত্রিনয়ন সেটা আবার খুবই দীপ্তিময়। অলৌকিক ভাবেই ওই মৃতা বউটির মুখটায় এসে চোখগুলো যেন মিলিয়ে গেল ! মাথার ভিতরটা ঘুরছে কিরকম ওর। সে রাত্রে আর বাড়ি ফেরা হলোনা ওর।

পাড়ায় কালীপূজোর প্যান্ডেলের বাঁশ পড়েছে সবে। এখনো দিন চারেক বাকী। পাড়ার ছেলেপুলেরাই করে পূজোটা বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে। ভাইফোঁটার পরদিন একটা ছোট করে জলসা হয়। মৃত্যুঞ্জয় বাবু আর প্রাণকৃষ্ণ এদের দুজনের গান তো থাকেই,কখনো সখনো মৃত্যুঞ্জয় বাবুর খাতিরে দু একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীও এসে যোগ দেন। কেউই কোন টাকাপয়সা নেন না। মুখোপাধ্যায় বাড়িতে একটা বড় রকমের ভোজ হয় সেদিন। প্রায় একশো জনের পাত পড়ে। সবাই নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করে। সে এক হৈ হৈ ব্যাপার।

প্রাণকৃষ্ণ এই ক'দিন আর কোথাও বের হয়নি। সকালে একটু রেওয়াজ করা ছাড়া আর তার গলার আওয়াজও কেউ পায়নি। মোহনবাগানের খেলা ছিল এরমধ্যে। বন্ধু পুলক ডাকতে এসে ফিরে গেছে। কেমন একটা একাকী ঘোরের মধ্যে কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। দাদা বৌদি মিলে নিজেদের গাড়ীতে করেই রুম্পা আর বাচ্চাদের ওর বাপের বাড়ি রেখে এসেছে। কালীপুজো-ভাইফোঁটা কাটিয়ে ওরা ফিরবে বোধহয়। রুম্পা আবার নতুন করে সন্তানসম্ভবা। তাই এই বাড়তি সতর্কতা।ওরা যখন যাচ্ছে বারান্দা থেকে ওদের যাওয়াটা দেখতে দেখতে একটু মনখারাপ

হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে গানের খাতাটা বের করে রামপ্রসাদী গানগুলো দেখছিল প্রাণকৃষ্ণ। "দিয়েছ এক মায়া চিন্তে, সদাই মরি তারই চিন্তে, না পারিলাম তোমায় চিনতে, চিন্তা কূপে ডুবে মরি!"

পুরো লাইনটাতে 'মরি' শব্দটায় বারবার এসে চোখ আটকে যাচ্ছে। ঘরে বৌদি খাবার ঢাকা দিয়ে গেছে। আজ তো চোদ্দশাক খেতে হয় না? কালীপূজোও এসে গেল তবে। একসময় ভাল তুবড়ি বানাত ওরা কজন বন্ধু মিলে নিজেরাই । সেইদিনগুলো আর কখনো ফিরবে না।

প্রাণকৃষ্ণ একটা প্যাডের পাতা টেনে কিছু লেখার চেষ্টা করতে বসলো। কিছু কথা, যেটা বলে হয়ে ওঠা হয়নি কখনো। কিন্তু কাকে লিখবে? দাদা? বৌদি? রুম্পা কে? মাথা কাজ করছে না। কি লিখলে ঠিক হবে? প্রাণকৃষ্ণর মাথার ভিতর আবার ব্যথা শুরু হয়। ওই নিমতলায় দেখা সধবা মহিলার লাল টকটকে সিঁদূর মাখা মুখটা কেন বারবার চোখের সামনে আসছে? এইবার !এইবার সেই নীলচে সবুজ জলতরঙ্গের মতো আলো আর ত্রিনয়ন ! এবার একটা বিশাল মুখব্যাদান করা করাল হাঁ মুখ, ওকে গিলে খেতে আসছে যেন !

প্রাণকৃষ্ণ যন্ত্রচালিতর মত পরণের কাপড়টা নিজের অজানিতেই কখন খুলে গলায় ফাঁস পড়িয়ে দিল। না, নিজে নয়, অন্য একটা জল্লাদের হাত যেন, কি দৃঢ়, কি পেশীবহুল কালো একটা হাত !কার হাত ওটা? শেষবারের মত জ্ঞান হারানোর আগে অনাগত সন্তান যার এখনো পৃথিবীর আলো দেখার সময় আসেনি তার মুখটুক দেখবার বড় সাধ হচ্ছিল আর সাথে সাথে তা না মিটতে পারার দুঃখও।

কালীপূজোর দিন সকালে যখন প্রাণকৃষ্ণর নিষ্প্রাণ দেহটা সি ডি ভ্যানে পুলিশ তুলে নিয়ে যাচ্ছিল তার খানিক আগেই পাড়ার প্যান্ডেলে রেকর্ড

প্লেয়ারে প্রাণকৃষ্ণর গাওয়া শ্যামাসঙ্গীত গুলোই একটার পর একটা করে বাজছিল।

যদিও এখন পুরো পাড়াটায় মৃত্যুর নির্মম কাঠিন্য শুধু জেগে আছে।

(সব চরিত্র কাল্পনিক নয়!)

সঞ্জীব সেন

সাঁকো

বিগত জনমের প্রেমিকা হয়ে ফুটে উঠছে বত্তিচেল্লির আঁকা যুবতী
কী জন্য মুছে যাচ্ছে এই দূরত্ব
কে রচনা করছে এই সাঁকো
মনে হচ্ছে পা বাড়লেই যেন ইতালি
কাচের দরজা ঠেলে বেড়িয়ে এল বত্তিচ্চেলির যুবতী,

ইতালি যাইনি আমি
তবু কেন দেখতে পাই এক বেহালা বাদক বিষাদের সুর তুলছে একা
এই বেহালা বাদক নিশ্চয় প্রেমিক ছিল!
শপিং মল নেই পাস্তা নেই, রেড ওয়াইন নেই
শুধু বিকেল আঁকছে একা বিরহী
আর বত্তিচেল্লির যুবতী যেন রাধিকাসুন্দরী,

ইতালির মেয়েরা নাকি বাঙালির মতই
প্রেমে পড়ে পূর্বরাগ ভেঙে আসে অভিসারে
রাতভর জেগে থাকে গুনগুন গানে

কি জন্য মনে হল রাইন নদী যেন আজ গঙ্গা
বত্তিচেল্লির সেই যুবতী যেন বিগত জনমের প্রেমিকা।

বন্ধু

দরজার প্লাই এ হাত রাখলাম
গর্ত হল পাঁচ আঙুলের
কাল রাতে স্বপ্নটা এখানেই শেষ হয়েছিল
অনামিকার জায়গায় চোখ রেখে দেখছি
তিন মাস তিন দিন হওয়া বৌ পেলব হাসি নিয়ে মায়ের সাথে সংসার করছে
আর বুড়ো আঙুলের গর্তে এক বয়স্ক কবি কবিতা লিখছে
ওদের থেকে দূরে আছি
দূরে থাকা মানে দূরে রাখা নয়
সকাল সন্ধ্যায় দরজায় টোকা দেয়
একটা সুকোমল হাত
একটা মনখারাপ জানালায় বসে
এই কদিনেই কেমন বুড়ো হয়ে গেছি
তাই দেখে গাছটির দুঃখ হয়
মন ভোলাতে নিচু হয়ে হাতটা বাড়িয়ে দেয় ।
গাছেরা জানে স্বপ্ন ধূসর হলে প্রকৃতি বন্ধু পাতায়।

সহমরণ

গোয়ালন্দে সেই মেয়েটি। কি যেন নাম,
অতসী না নয়না, কি চোখ কি ঠোঁট!
বলেছিল চোখে আর ঠোঁটে একটাই ভাষা
ভালবাসি ভালবাসি।এতদিন পরেও,

আজও মেয়েটা, শিবের থানে, ব্রত আজও
হেসে বলে একদিন না মানে হ্যাঁ ছিল মনে
তার নামে গোপনে সোম শুক্র ব্রতোপবাস
তারপর হ্যাঁ-এর খুব কাছে রাতে ঘুমে স্বপ্নে।

তখন থেকে একটাই নাম চোখে রাখা
তখন থেকে একটাই ভাষা ঠোঁটে রাখা
ভালবাসি ভালবাসি। কত ঝড় বৃষ্টি জল।
হেসে বলল ভালবাসা মানে তো সহমরণ।

যাজ্ঞসেনী আর পাঁচজন

জানি, বালুচরে লিখে রাখা নাম
একটু পরে মুছে যাবে ঢেউ এলে
তবুও তো লিখে রাখি,

যাজ্ঞসেনী কি আসবে রিইউনিয়নে! আসলে কতদিন পর দেখা হবে বলত! আচ্ছা ও কি ফেসবুকে নেই। কতভাবে ওকে ট্রাই করেছি। জানিস ওর খবর। ও কী আগের মতই প্রাণখোলা আছে। দেখা হলে ছুঁটে আসবে আগের মত। কি ভালই না ছিল দিনগুলো! সময়ের হাতে কী আগুন থাকে! পুড়িয়ে দেয় সব কিছু! যাজ্ঞসেনী খবর কার কাছে পাবো বলত। কথাগুলো শুনে মনে হল রণজয় ড্রিঙ্ক করে আছে। পেটে জল পরলে দুঃখ গুলো কবিতা হয়ে বেরিয়ে আসে। রণজয় অনেকক্ষণ ধরেই বকে যাচ্ছিল। ওর কথা শেষ হতেই বললাম যাজ্ঞসেনীর সব খবর পাবি অরিন্দমের কাছে। সেদিন ফোন করেছিল। ও এখন সানফ্রান্সিসকো। কলেজের প্রফেসর। ও তো আসবেই বলেছে। ওই বলল যাজ্ঞসেনী এখন নিউইয়র্ক। যাজ্ঞসেনীকে বলেছ রিইউনিয়নের কথাটা। যাজ্ঞসেনী হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি। রণজয় বলল রাতুল শমীক শচীন ওরাও আসবে আমায় বলেছে! রণজয় বলল যাজ্ঞসেনী কে একটা গান করতে বলিস! মনে পরে গেল কথাটা শমীক আর শচিন কে দেখতে ভাই ভাই আমরা নিজেদের ভিতর বলতাম ওরা নকুল সহদেব আর রাতুল ছিল ফিসক্যালি ভীম আর আমায় ওরা বড়ভাই মানে যুধিষ্ঠির বলত। মনে মনে হেসে উঠলাম। তালে অর্জুন কে! এই প্রশ্নে রণজয় কেন নীরব থাকত! দেখতে দেখতে রিইউনিয়ন এসে গেল। অজিত বলল আপাতত কুড়ি জনের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেছে। অজিতের এসব ব্যাপারে হাতযশ আছে। সাংগঠনিক কাজ ভালই পারে। বাকি

বন্ধুরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কেউ হয়ত ইহজগৎ ছেড়ে চলে গেছে। যাজ্ঞসেনী নবীনবরণে একটা গানটা করেছিল গিটারে। অরিন্দম আগে থেকে চিনত। ওই বলেছিল কলেজে দারুণ একটা মেয়ে ভর্তী হয়েছে নাম যাজ্ঞসেনী ওয়েস্টার্ন গান জানে। যাজ্ঞসেনী পরে বলেছিল গানটা জন ডেনভার এর "কান্ট্রি রোডস টেক মি হোম।" তারপর থেকেই আমরা পাঁচজন আর ও বন্ধু হলাম। কলেজেও সবাই বলত আমারা পাঁচজন ওর অশ্বারোহী। যাজ্ঞসেনী এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করল। বলল- "কি রে জয় সব ঠিকঠাক আছে তো! তবে দেখা হচ্ছে কাল। আমার দারুণ আনন্দ হচ্ছে। অজিত দারুণ একটা কাজ করেছে বল! ও না হলে সম্ভব হত না!" এখানে পা দিয়েই ওর মনে পরে গেল সব স্মৃতি। যাজ্ঞসেনীর মনের বাতিঘর ছুঁয়ে যাচ্ছে সব স্মৃতি। ওর চোখে জল চলে আসছে। কেন সময় এভাবে দ্রুত ছোটে। গঙ্গার দিক দিয়ে আসা হাওয়া ওর চুল উড়িয়ে নিচ্ছে। যাজ্ঞসেনী যে গানটা গাইবে মনে মনে গেয়ে নিল "আমি শুনেছি সেদিন তুমি নীল ঢেউয়ে চেপে নীল জল দিগন্ত ছুয়েঁ এসেছ.... আবার যেদিন যাবে আমাকেও সঙ্গে নিও...বলো নেবে তো আমায়।" যে কুড়ি জন আমরা মিলন উৎসবে জড়ো হয়েছি যাজ্ঞসেনী ছাড়া সবাই আগত। অজিত একটা প্রোগ্রাম কনডাক্ট করেছে। যাজ্ঞসেনী গাইবে। আমি একটু দূরে বসে ছিলাম। মন খারাপের মেঘ কার ভিতরে না নেই! তবুও তো সবাই ফ্লুরোসেন্ট হাসি মেখে নেয় ঠোঁটে। তবে আমি পারছি না কেন? একটু আধতু লেখালিখি করি। তাই হয়ত ভাবনা চিন্তা গুলো গভীরে নিয়ে যায়। না সবেতেই গল্পের রসদ খুঁজি! না যাজ্ঞসেনীর প্রতি আমারও একটা সফট ফিলিং ছিল, তাই! যাজ্ঞসেনীর সঙ্গে দেখা হবে দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর। ভেবেছিলাম যাজ্ঞসেনী হয়ত পালটে গেছে। কিন্তু এতটা ভাবিনি যে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পোগ্রামটা ও একাই কনট্রোলে নিয়ে নেবে। গিটার নিয়ে আসবে সঙ্গে করে। উনিশ বছরের মত লাফিয়ে স্টেজে উঠে গান

ধরবে 'আমি শুনেছি সেদিন তুমি নীল ঢেউয়ে চেপে...আমি তাকিয়ে থাকলাম। মনে হল জীবনের পঁচিশ বছর কেউ যেন ডিলিট করে দিয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে ও আমার কাছে এল। বলল নিউইয়র্ক গেলি আমার ওখানে যেতে পারলি না। বলল তুই লেখক হয়ে যাবি বোঝা যাইনি। তোর বই আমি আমাজন থেকে নিই তো। জানিস পুরী-তে গেলে আমি বালুচরে লিখে রাখতাম তোদের নামগুলো। আর ঢেউ এলে মুছে যেত। জানতাম তবুও লিখে রাখতাম। আমি যাজ্ঞসেনির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল। চাঁদের আলোয় চরাচর ভেসে যাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখছিলাম। সেরাতে আর ঘুম এল না। মনে পড়ে গেল কলেজের দিনগুলো। মনে হল সেদিনের ঘটনা। যাজ্ঞসেনী ওয়েস্টার্ন গানের ভক্ত ছিল। ব্রায়ন এডামস ওর প্রিয় গায়ক। রণজয় ওকে প্রোপজ করেছিল। তবে ফিলিংস আমাদের সবারই একটা ছিল। ভোরে মর্নিং ওয়ার্কে বেড়িয়ে অজিতকে ফোনে ধরলাম। যাজ্ঞসেনী আসছে তো! অজিত বলল মনে হয় যাজ্ঞসেনী আসবে না! অজিত বলল অরিন্দম কে ফোন কর ও হয়ত ডিটেলে বলতে পারবে। অরিন্দমকে ফোন করলাম। বললাম তুই যাজ্ঞসেনীর ব্যাপার কিছু জানিস ও কি আসবে! অরিন্দম বলল যাজ্ঞসেনী বলেছে এটা সারপ্রাইজ থাক।

অজিত ইডেন গার্ডেনের কাছে একটা কমিউনিটি হল বুক করেছিল। গিয়ে দেখি অজিত দারুণ আয়োজন করেছে। অজিত ফোন করেছে। যাজ্ঞসেনী এসেছে। ও বলছে ওকে যে পাঁচজন অশ্বারোহী ঘিরে থাকত তারা এসে যদি নিয়ে যায় তবেই যাবে। অজিত বলল আমি তোদের পাঁচজনকে ফরোয়ার্ড করে দিয়েছি। আমরা পাঁচজন যাজ্ঞসেনীর বাড়িতে পৌছে গেলাম। গিয়ে দেখি ওখানে একটা বহুতল হয়েছে। যাজ্ঞসেনী বাবার নাম জানিনা। কার নামে খুঁজব। রণজয় বলল রিসেপসনে বললে বলে দেবে ল্যান্ডলর্ড কোন ফ্লোরে থাকে। আমরা যাজ্ঞসেনীর ফ্লাটে পৌছে গেলাম। নক করতে যে দরজা খুলে দিল তার দিকে তাকিয়ে

আমরা সবাই ফিউজ হয়ে গেলাম। সামনে দাড়িয়ে উনিশ বছরের যাজ্ঞসেনী। মেয়েটি বলল আপনারাই তাহলে মায়ের পাঁচজন অশ্বারোহী। যাজ্ঞসেনী এসে দাঁড়িয়েছে নীল রঙের চুড়িদারে। কে বলবে চল্লিশ পেরলে মেয়েরা বুড়ি হয়ে যায়। আমরা পাঁচজন ভাসাহীন দাঁড়িয়ে আছি। যাজ্ঞসেনী বলল চল এরপর যেতে দেরি হয়ে যাবে। যাজ্ঞসেনী গিটারটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে এল। ওলা তে যেতে যেতে আমরা সবাই বললাম একটা গান গাইবি, অন্যরকম। যাজ্ঞসেনী গাইল- "হয়েন ইউ সে নাথিং এট অল" আমরা সবাই তাল দিচ্ছি। রণজয় সামনে চুপচাপ বসে আছে। আমাদের ভিতর যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ওর ভিতর নেই। জানি আমরা কারণটা। ওর ভিতর একটা পাপবোধ কাজ করছে। রণজয় যাজ্ঞসেনীকে প্রোপজ করেছিল। যাজ্ঞসেনীর প্রত্যাক্ষান মন থেকে মেনে নিতে পারিনি আজও। যাজ্ঞসেনী বলেছিল তোরা পাঁচজন আমার অশ্বারোহী। তাই বলে আমি কিন্তু মহাভারতের যাজ্ঞসেনী নই। আর তুইও অর্জুন না। যাজ্ঞসেনীকে মাঝখানে রেখে আমরা এনট্রি নিলাম ।

সমাজ বসু

নুন

তারা মিলেমিশে নুনের শহরে বাস করে,
সারাদিন নুনের পোশাকে ওঠে বসে–
হাসে– কথা বলে–
চিন্তায় ডুবে থাকে–
তারপর দু মুঠো নুনের গ্রাসে রাত নামে–
সারারাত গলতেই থাকে স্বপ্নগুলো।

নুনের শহরেই তাদের শেষকৃত্য হয়।

সুনীতা

ঠিকানা

সবই জানি, সেই সকল ঠিকানারা মৃত, হিমঘরে থাকে।
শাপলাঘেরা পশ্চিম পথ,
সেদিক থেকে কখনোই আর কোন পিউ কঁহা ডাকবে না
অবেলায় – পুকুরের পথে
দেখাশোনার কথা, কলসীর জলে পাতার ঘন ছায়া; গভীরতর হবে
এলোমেলো কি বাতাস চলেছিল:
তখন, উড়িয়ে নিয়েছিল বহুদূর তানবিহীন মধ্যমা
তার ছাপ এসে লেগেছে
দীর্ঘ চুমুর মত; মৃত কপোলে-
আজ বহুদিন পর,
জানি সবাই নিশ্চিতভাবে, বেলাশেষে
ঠিকানাগুলো সব, মাটিচাপা পড়ে আছে

ইস্তেহার

দেখা না গেলেও, ডলা দিলেই উঠে আসে চষিটানে
এত ধুলো! এত ধুলো ধর্মাবতার! জমে ছিল কোনখানে;
কলরোল এত, তবু গুছিয়ে রাখা গেছে সমবেত প্লুতস্বর
চিনবে না কি ক'রে, অতিবাহিত – শবের পরে শবের প্রহর।
সমবেত সেই আত্মরোল থেকে উঠে আসে দুই-একটি শবের অনুপাত
সময় নিজের মত সব নিয়ে গেছে। ভাসমান মনোরঞ্জক দু-
একটি 'বাত'
আবরণী সরিয়ে যদি এমন হয় – শবেদের আত্মচিৎকার উঠে আসে
প্রতিটি শ্বাসহীন পলের হিসেব মিলিয়ে নিতে চায় বাতহীন রুদ্ধশ্বাসে

হরিণী সময়সূচী

হরিণী চোখের সজলতা দিয়ে নামিয়ে আনো নব্যমাংসস্তূপে!
এলোমেলো লতানো অন্ধকার, ভীষণ ঘুম পায়, হাই ওঠে, রঙীন অবসাদ
জিভ আড়ষ্ট ফেরারী; আঙুলের ডগায় গজিয়ে ওঠে বন্য ছত্রাক-
সেই মুহূর্তে চট্‌কা ভেঙে গাছেরা বেড়ে ওঠে চড়চড় করে,
খরগোশদের ভয় পাওয়ার কৌমার্যে প্রতীকী আলো বের হয় সূর্য থেকে
হূল ফোটানো, তীক্ষ্ণভাবে শরীরে গেঁথে যায়, আলো!
কিন্তু কি আশ্চর্য!
কোন পরিচর্যা শব্দ বেরিয়ে আসে না অচেনা লতার ঝোপ থেকে;
বেতসী নদীরা
এগিয়ে এসে হাল ধরে – উথলে ওঠে জল, সে জলে
মাংসবিচ্ছিন্ন শরীর ধুয়ে যায়,
রক্ত বয়ে চলে যায় নদীতে;
মাঝরাতের প্রকান্ড পাহাড়, হাঁফ ধরানো: নিয়ম মেনে পৌঁছতে হয় আলো ফোটার আগে
বেতসী নদীতে বয়ে গেছে মাংস ছাড়ানো রক্ত–
এখন একমাত্র নিদান গাছেদের আলিঙ্গনে গভীরতর শীতঘুম।

একজোড়া ফুলকপি ও শীতকালীন বনভোজন

খাতা খোলার পুরষ্কার ফুলের তোড়াতে ভবঘুরের ঘোলা চোখজোড়া আটকে থাকে
কি যেন এক ভয়ঙ্কর সূচালো, হারিয়ে গেছে সবজি মান্ডিতে, জোড়া ফুলকপিতে গেঁথে;
দ্রব্য-তেলের ঊর্ধ্বগতিতে; ডাল জলের তারল্যে উজ্জ্বল সারখেকো পোকার নাব্য-ভাসমান স্থিতি;
যানের পথে রাখা আছে শুকনো কাশি, শীতের দরদে পীচ ঢেকে যায় – হিমকণা সাঁটা ঘন শ্লেষ্মা-
এরপর আমরা ধরি জীবনমুখী গান, শব্দগুলি টাঙানো থাকে প্রাসাদের সামনের শালগাছে;
রাত হলে জোনাক পোকা তরলের মত ঢুকে আসে, শরীরের মাঝে;
শিরায় শিরায় কণা কণা আলো
উল্কাপাতের উর্বরতা মিশে থাকে এ মাটিতে, সবজি-ফলের সবুজে, শ্যাওলা ধরা ঝিমানো আলোতে।
কালো পীচ রাস্তা ঢেকে কালিক লালমাটির ধুলো, দেশিভাব অস্মিতা: অমরত্ব দিয়ে সব তুলে রাখা আছে-
সারসার তপশিলে লেখা আছে হিমঘরে থাকা গত মরশুমের সবজি ফলের স্বাস্থ্যসচেতনতা সংক্রান্ত অধিবিদ্যক আঁকিবুকি।
প্রস্তাবিত পরিবেশ সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীনে মাটিখেকো কেঁচোরা ফসফেট খেয়ে মিলিয়ে যায় ধ্রুবক চলনে
ভেসে থাকে কালপুরুষের লিখনে শীতরাত্রির উত্তরগাথা ঝুলন্ত বারান্দায়: বমনে জ্যোৎস্না উদ্রেককারী-
আমরা শীত দিনের উল্লাসে নদীর অববাহিকায় বনভোজনে ভিড়ে যাই

প্রভূত খাদ্যদ্রব্যের সাথে
প্রাচুর্য যা কিছু চৌর্যগীতি মুখরিত পথে আসে।

সৌমেন দেবনাথ

ফাঁপা লেখক

একবার এক পত্রিকায় লেখা পাঠালাম। ফিরতি ই-মেইলে সম্পাদক মোবাইল নম্বর চাইতেই বিনাসঙ্কোচে দিয়ে দিলাম। পরক্ষণেই ফোন এলো, সম্পাদক ফোন করেছেন, বিগলিত অবস্থা আমার। কোনো পত্রিকায় লেখা ছাপে না, মনে হচ্ছে এ পত্রিকায় আমার লেখা যাবেই। সম্পাদক আমার লেখার খুব প্রশংসা করলেন, আমার লেখার ভেতর নাকি জাদু আছে, লেখার গাঁথুনি খুবই ভালো, লেখার সাহিত্যশৈলী চমৎকার, কালোত্তীর্ণ হবে। পরে পত্রিকার উন্নয়নের জন্য টাকাও চাইলেন। কোথাও আমার লেখা ছাপে না, এ পত্রিকায় আমার লেখা জায়গা পাবে, তাই পত্রিকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে টাকা দিতে রাজি হয়ে গেলাম। লেখা ছাপলে আমার লেখক বন্ধু সুভাষকে বুক ফুলিয়ে বলবো। ও এত ভালো লেখে, হিংসা হয়। যে পত্রিকাতেই লেখা দিক ওর লেখা স্থান পাবেই। লেখার গুণের কারণে, অন্য কোনো কারণে নয়।

পরদিন ওর বাসায় গেলাম। দেখলাম ও বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা পাঠাচ্ছে। কোথায় কোথায় লেখা পাঠালো মেইলের সাবজেক্ট দেখলাম। দেখলাম আমি যে পত্রিকায় লেখা দিয়েছি উক্ত পত্রিকায়ও ও লেখা দিয়েছে। ওর লেখার সাথে আমার লেখাও এক পত্রিকায় থাকবে ভেবেই ভালো লাগছে। বলবো বলে মুখিয়ে আছি, দেখ সুভাষ তোর লেখার মতই আমার লেখাও গুণগত মানসম্মত হচ্ছে। নতুবা ছাপবে কেন? যাহোক, যথাসময়ে পত্রিকা প্রকাশ হলো। সূচিপত্র তিনবার পড়লাম। সুভাষের লেখা নেই। হতভাগার লেখা রয়েছে। লজ্জায় পত্রিকাটি বন্ধুকে দেখাতেই পারিনি।

মুখশ্রুতি

আমায় নিয়ে আমাদের পরিবার ও গ্রামে মুখশ্রুতি আছে যে, আমি ছোটবেলাতে বই বিক্রি করে ভূতের ডিম খেয়েছিলাম। ভূতের ডিম কোম্পানির দেয়া এক প্রকার মিষ্টান্নের নাম, দেখতে ছোট ছোট মার্বেলের মত, লজেন্সের মত চুষে খেতে হয়।

বড় হওয়ার পরও যখন দাদু-কাকা সম্পর্কীয়দের মুখ থেকে কথাটি শুনি তখন খুবই বিব্রত হই। মাকে বলতেও মা বলে, হ্যাঁ, ছোটবেলাতে তুমি বই বিক্রি করে ভূতের ডিম খেয়েছিলে। বাবাও তাই বলে। নিজ দাদু আরো রসিয়ে রসিয়ে বলে।

স্কুল মাঠের সামনে একটাই দোকান। একদিন ভেবেছিলাম দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করি। পঁচিশ বছর আগের ঘটনা দোকানদারের কি মনে আছে? তাছাড়া দোকানটা এখন তাঁর ছেলে চালায়। যাহোক, বাড়ি এলে স্কুল মাঠে বসে ছেলেপেলেদের খেলা দেখি। মাখন দাদু অনেক দিন পর আমাকে দেখে জানতে চাইলেন বর্তমানে কোথায় থাকি, কি করছি? উত্তর শুনে খুশি হলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, ছোটবেলা এই স্কুল মাঠে তুমি বই হারিয়ে ফেলেছিলে। কি কান্নাকাটি করছিলে! তারপর তোমাকে এক প্যাকেট ভূতের ডিম কিনে দিতেই তোমার মুখে হাসি ফোঁটে। হাসতে হাসতে বাড়ি চলে যাও।
বিকালে তোমার দাদুর সাথে দেখা হতেই বলি, তোর নাতি তো বই বিক্রি করে ভূতের ডিম খেয়েছে। তারপর হাসতে হাসতে মাখন দাদু চলে গেলেন। এত বছরের একটা মিথ্যে অপবাদ থেকে মুক্ত হলাম জেনে মনে মনে শান্তি পেলাম।

পরচুলা

অল্প বয়সে মাথার চুল পড়ে যাবে কখনো ভাবিনি। মা বললো, পরচুলা লাগিয়ে নিতে। মায়ের কথা মতো পরচুলা লাগিয়ে নিলাম। বাড়ি আসতেই কেউ আমাকে চিনছে না। প্রতিবেশিরাও জেনে হাসাহাসি করলেন। ঐ রাতে বিশেষ কাজে এক অচেনা ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাতের প্রয়োজন পড়ে। অচেনা ব্যক্তিটির বাসায় যেতে যেতে রাত হয়ে যায়। লোকটি তখন আমাকে জোরারোপ করে বাড়ি আসতে দেননি। রাতে দুজন এক বেডেই ঘুমালাম। ঘুমাতে ঘুমাতেই দেখি লোকটি নাক ডাকাচ্ছে। যাহোক, পরচুলা খুলে আমিও ঘুমিয়ে গেলাম। সকালে উঠে দেখি লোকটি আমার দিকে অবাক চোখে চেয়ে। বললেন, আপনি কি সেই লোক? রাতে তো আপনি আসেননি? কে আপনি?

আমি উনাকে নির্ভয় দিলাম। আর বললাম, পরচুলা পরলে চেনা লোকগুলো আমাকে চেনে না আর পরচুলা না পরলে অচেনা লোক চেনে না। হায়রে আমার টাক!

টুলিপের বিয়ে

মাসান্তে যে বেতন পাই সংসার আর ঘরভাড়া সামলে উঠা দায়। তার উপর নিয়মিত নিমন্ত্রণ লেগেই আছে। আজ কলিগের ছেলের বিয়ে, কাল কলিগের মেয়ের বিয়ে, আজ কলিগের বিয়ে, কাল কলিগের ছেলের জন্মদিন, মেয়ের অন্নপ্রাশন, ছেলের সুন্নতে খৎনা। আজ ছাত্রের বিয়ে তো কাল ছাত্রীর বিয়ে। প্রথম দিকে সব নিমন্ত্রণ রক্ষার চেষ্টা করলেও এখন যাওয়া কমিয়ে দিয়েছি।

টুলিপের বিয়ের সময় বিভাগের তিন স্যার পড়েছি বিপদে। দুদিন পরপর ফোন করে আর বিয়ের তারিখ মনে করিয়ে দেয়। তিনজনেই সিদ্ধান্ত নিলাম টুলিপের বিয়েতে যাবো।

বিয়ের দিন হাতে কোন টাকা নেই। তিনজনের কাছ থেকে ব্যর্থ হয়ে চতুর্থজনের কাছে পাঁচশত টাকা ধার পেলাম। গেলাম টুলিপদের বাসায়। আত্মীয় স্বজনে ভরা। কে কার খোঁজ নেয়? বাবার আত্মীয়দের বাবা, মায়ের আত্মীয়দের মা খোঁজ নিচ্ছেন, আমরা টুলিপের স্যার, আর টুলিপ আছে বৌ সেজে, যাকে ঘিরে নিকটজনদের হৈহট্ট। তাই তার সাথে দেখা না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে খেয়ে নিলাম।

হীনমন্যতা, ইতস্ততা আর বিড়ম্বনায় পড়লাম আশীর্বাদ টেবিলে আশীর্বাদস্বরূপ টাকা দেবার বেলায়। সবাই দিচ্ছে তিন হাজার, চার হাজার, পাঁচ হাজার টাকা করে। সেখানে পকেট থেকে পাঁচশত টাকা বের করি কি করে!

তিন স্যারই একই সমস্যায় পড়ি। পরে সিদ্ধান্ত নিলাম তিনজনের টাকা একত্রে জমা করে একজনের নামে জমা দেবো। কাজল স্যার সিনিয়র হওয়াতে তাঁর নামে জমা করে বিয়ে বাড়ি থেকে ভেগে পড়লাম।

টুলিপ যেদিন বিয়ের পর প্রথম কলেজে এলো আমাকে দেখেই বললো, স্যার, এত করে বলার পরও আমার বিয়েতে যাননি, খুব কষ্ট পেয়েছি।

টুলিপের কথাতে সাময়িক খারাপ লাগলেও ওর বিয়ের দিন যে বেইজ্জতি হইনি, এটাও যেন একটা প্রাপ্তি।

মোহনার চরিত্র

এইচএসসি পাশের পর যে যার যোগ্যতায় বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গেলাম। নতুন নতুন বন্ধু আর পরিবেশ সবার জীবনে আসলো। পুরাতন বন্ধুগুলোর স্থানে নতুন বন্ধুরা জায়গা পেলো। আমাদের কলেজ জীবনের বন্ধুদের মধ্যে দূরত্ব স্বাভাবিক কারণে বাড়লেও আমার সাথে মোহনা আর সাব্বিরের সম্পর্ক কলেজ জীবনের মতই অটুট থাকলো। মোহনা প্রায় বলে, তোর ইউনিভার্সিটির কোন বন্ধুর সাথে আমার প্রেমের ব্যবস্থা করে দে না! স্বপন তার ইউনিভার্সিটির এক ছেলের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। সে ছেলের সাথে আমার প্রেম জমে ক্ষীর। তুই আমার প্রিয় বন্ধু, তোকে বলতে দ্বিধা নেই। প্রেম তো না টাইম পাস করবো।

আমি মোহনার কথা শুনে হতবাক। মোহনার নাম উল্লেখ না করে ব্যাপারটি সাব্বিরকে বললাম। সাব্বির বললো, আমার নম্বরটা তোর সেই বান্ধবীকে তবে দে।

আমি মোহনার এ ব্যাপারটা সাব্বিরকে কি করে বলি? ওর পিড়াপিড়িতে বললাম, বন্ধু সে মেয়ে আর কেউ না, আমাদের বান্ধবী মোহনা। প্রেমের নামে বিভিন্ন ছেলেদের সাথে টাইম পাস করে এখন।

এ কথা শুনতেই সাব্বির চুপ হয়ে গেলো। মোহনার সাথেই তো সে গত দু বছর প্রেম করছে।

Week	Title	Genre
May, 4th Week	ট্রাম্পেটবাদক	কবিতা
May, 5th Week	যোগসূত্র	কবিতা
May, 1st Week	মা জননী	কবিতা
May, 2nd Week	মা	কবিতা
May, 1st Week	মঁচশিল্প	কবিতা
May, 4th Week	ভঙ্গুর	কবিতা
May, 2nd Week	মা বাবকে খুঁজি	কবিতা
May, 4th Week	বিকল্প	কবিতা
May, 1st Week	যে গল্পের শেষ হলো না	ছোটগল্প
May, 1st Week	কালচক্র	কবিতা
May, 3rd Week	ঘৃণার আগুন	কবিতা
May, 5th Week	কলরব	কবিতা
May, 1st Week	ভোলার নয় সখি সেই দিনের কথা.....	কবিতা
May, 2nd Week	ভুলে যাও অভিমান	কবিতা
May, 3rd Week	অনুভূতি	কবিতা
May, 4th Week	ভালোবাসা	কবিতা
May, 3rd Week	সমাপ্তি	কবিতা
May, 3rd Week	ব্যাচেলর ভাড়াটে	
May, 2nd Week	দুই পুরুষ	কবিতা
May, 5th Week	তরুণ সন্ন্যাসী	কবিতা
May, 4th Week	লুকোনো অশ্রু	কবিতা

May, 1st Week	মায়ের স্নেহ	কবিতা
May, 3rd Week	বিচিত্র	কবিতা
May, 1st Week	শিশু মন	কবিতা
May, 5th Week	অহংকারী	কবিতা
May, 2nd Week	এভাবেও সব হয়	কবিতা
May, 2nd Week	জয়া	কবিতা
May, 4th Week	ঈবাদাহ্'র ঈবাদাত	অণুগল্প
May, 5th Week	করি খুশির ঈদ	কবিতা
May, 1st Week	মনের ডায়েরি	কবিতা
May, 2nd Week	আসল বিশ্বযুদ্ধ	কবিতা
May, 4th Week	করোনা	কবিতা
May, 3rd Week	হায়রে গ্যাসট্রিক	কবিতা
May, 2nd Week	ছেলে মানুষ	কবিতা
May, 4th Week	প্রিয় আম	কবিতা
May, 5th Week	ছয় পুরুষ	কবিতা
May, 5th Week	সেই জানলাটা আজও বন্ধ	কবিতা
May, 1st Week	যোগ- বিয়োগ	গল্প
May, 4th Week	আনন্দস্বরূপা	গল্প
May, 5th Week	আমার সাধ না মিটিল	ছোটগল্প
May, 3rd Week	ইস্কুল ব্যাগ	গল্প
May, 1st Week	সাঁকো	কবিতা
May, 3rd Week	বন্ধু	কবিতা

May, 4th Week	সহমরণ:	কবিতা
May, 5th Week	যাজ্ঞসেনী আর পাঁচজন	ছোটগল্প
May, 1st Week	নুন	কবিতা
May, 4th Week	হরিণী সময়সূচী	কবিতা
May, 5th Week	একজোড়া ফুলকপি ও শীতকালীন বনভোজন	কবিতা
May, 1st Week	ঠিকানা	কবিতা
May, 2nd Week	ইস্তেহার	কবিতা
May, 2nd Week	মুখশ্রুতি	অণুগল্প
May, 4th Week	টুলিপের বিয়ে	অণুগল্প
May, 5th Week	মোহনার চরিত্র	অণুগল্প
May, 1st Week	ফাঁপা লেখক	অণুগল্প
May, 3rd Week	পরচুলা	অণুগল্প